Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা বেগম

রোলঃ 228020362

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী অর্থনীতি রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা বেগম

রোলঃ 228020362

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী অর্থনীতি রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা বেগম, আইডিঃ 228020362 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী অর্থনীতি রিবা এবং এর বিকল্প সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আসমা বেগম

আইডিঃ 228020362

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় :ইসলামি অর্থনীতির ধারণা ও পটভূমি:......5

টপিক:১.১. ভূমিকা :......5

টপিক:১.২. ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা:......8

টপিক:১.৩. ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:......9

টপিক:১.৪. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার উৎপত্তি :......11

টপিক:১.৫. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :......11

টপিক:১.৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :......12

টপিক:১.৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থা :......13

দ্বিতীয় অধ্যায় :ইসলামি অর্থব্যবস্থা বনাম অন্যান্য অর্থব্যবস্থা :......14

টপিক:২.১. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা:......14

টপিক:২.২. উৎসগত পার্থক্য :......14

টপিক:২.৩. নীতিমালা ও বিধিবিধান:......15

টপিক:২.৪. সম্পদের মালিকানা :......16

টপিক:২.৫. জীবন পদ্ধতি :......17

টপিক:২.৬. ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা :......18

টপিক:২.৭. উৎপাদনের লক্ষ্য :......19

টপিক:২.৮. উৎপাদন পদ্ধতি :......19

টপিক:২.৯. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব :......20

টপিক:২.১০. জীবিকা অর্জন :......20

টপিক:২.১১. সম্পদের বণ্টন :......21

টপিক:২.১২. বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিকার :......22

টপিক:২.১৩. সুদের লেনদেন :......22

টপিক:২.১৫. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :......24

টপিক:২.১৬. মজুরী নির্ধারণ :..25
টপিক:২.১৭. যাকাত :...26
টপিক:২.১৮. রাষ্ট্রের ভুমিকা :...27
টপিক:২.১৯. রাজস্ব ব্যবস্থা :...27
তৃতীয় অধ্যায় : রিবা (সুদ) ধারণা,প্রকারভেদ ও অবস্থান:...28
টপিক:৩.১. রিবার সংজ্ঞা :..28
টপিক:৩.২. ইসলামের আলোকে রিবার পরিচয়:..29
টপিক:৩.৩. রিবার প্রকারভেদ:..30
টপিক:৩.৪. আলেমদের মতে সুদের প্রকারভেদ:..31
টপিক:৩.৫. অর্থনীতিবিদ ও আধুনিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে রিবা:................................32
টপিক:৩.৬. কুরআন ও হাদীসে রিবার নিষিদ্ধকরণ:...33
টপিক:৩.৭. বিভিন্ন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সুদের অবস্থান...35
টপিক:৩.৮. ইহুদি ধর্মে সুদ:...35
টপিক:৩.৯. খ্রিস্টান ধর্মে সুদ:..36
টপিক:৩.১০. হিন্দু ধর্মে সুদ:..36
টপিক:৩.১১. বৌদ্ধ ধর্মে সুদ:..37
টপিক:৩.১২. ইসলাম ধর্মে সুদ:...37
টপিক:৩.১৩. সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ:...40
টপিক:৩.১৪. প্লেটো তার Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে আদর্শরাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করেন..42
টপিক:৩.১৫. অ্যারিস্টটল তার Politics নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখান যে,.......................42
টপিক:৩.১৬. ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে সুদ বা রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ.....................43
চতুর্থ অধ্যায় : রিবার প্রভাব-ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্রে...45
টপিক:৪.১. ব্যক্তি পর্যায়ে রিবার প্রভাব...45

টপিক:৪.২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রিবার প্রভাব..45
টপিক:৪.৩. বৈশ্বিক অর্থনীতিতে রিবার প্রভাব...46
পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রিবার বিকল্প সমাধানসমূহ..................................47
টপিক:৫.১. মুরাবাহা (Murabaha): 47
টপিক:৫.২. মুদারাবা (Mudarabah) 48
টপিক:৫.৩. মুশারাকা (Musharakah) 48
টপিক:৫.৪. ইজারা (Ijarah):...49
টপিক:৫.৫. সালাম ও ইসতিসনা (Salam & Istisna):...49
টপিক:৫.৬. ওয়াকালা ও কফালা (Wakalah & Kafalah): 50
টপিক:৫.৭. বাকিতে কেনা-বেচা...51
টপিক:৫.৮. যাকাত..51
টপিক:৫.৯. কার্যে হাসানা:...51
টপিক:৫.১০. রিবার বিকল্প & কর্জে হাসানা 52
টপিক:৫.১১. কর্জে হাসানার গুরুত্ব ও ফলাফল:..53
ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামি ব্যাংকিং ও তাকাফুল (ইসলামি বীমা)...54
টপিক:৬.১. ইসলামি ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম 54
টপিক:৬.২. শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের ভূমিকা: 55
টপিক:৬.৩. তাকাফুল: ইসলামী বীমার ধারণা ও প্রয়োগ:..56
সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা: 57
টপিক:৭.১. সরকারি ব্যাংক :...57
টপিক:৭.২. বেসরকারি ব্যাংক...58
টপিক:৭.৩. ইসলামি ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণ কি কার্যকর সমাধান? 59
টপিক:৭.৪. চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা: 62
অষ্টম অধ্যায় :ইসলামি অর্থব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশসমূহ...65

টপিক:৮.১.অনাদায়ী বিনিয়োগ আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ 66

টপিক:৮.২.সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা 66

টপিক:৮.৩.ইসলামী ব্যাংক ও অর্থায়ন খাতের জন্য স্বতন্ত্র টাস্কফোর্স : 67

টপিক:৮.৪.পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন : 68

টপিক:৮.৫. বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু :................................ 68

টপিক:৮.৬. উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা :.. 69

টপিক:৮.৭. জনগণের সম্পৃক্ততা ও আস্থা বৃদ্ধি :.. 70

নবম অধ্যায় :রিবা বা সুদ বিস্তারের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা & ইসলামে সমাধান:............ 71

টপিক:৯.১. আধুনিক বিশ্বে রিবা বা সুদের বিস্তার ও ইতিহাস:.................................. 71

টপিক:৯.২. বর্তমানযুগে সুদ ছাড়া চলার বাস্তবতা: 73

টপিক:৯.৩. সুদের প্রয়োজনের ভ্রান্ত ধারণা ও ইসলামী সমাধান :................................. 73

টপিক:৯.৪. সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ইসলামী নীতিমালার প্রাসঙ্গিক : 76

টপিক:৯.৫. নিরুপায় অবস্থায় সুদের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইসলামি মতামত: 78

দশম অধ্যায় :রিবা বা সুদের ভয়াবহতা, শাস্তি ও মুক্তির উপায় :................................ 80

টপিক:১০.১. সুদের ভয়াবহ পরিণাম :.. 80

টপিক:১০.২. সুদ খাওয়ার শাস্তি:.. 83

টপিক:১০.৩. সুদের অপরাধ ও শাস্তির বিবরণ :.. 84

টপিক:১০.৪. সুদ খাওয়ার ৭০টি গুনাহ: 86

টপিক:১০.৫. রিবা থেকে মুক্ত থাকার উপায় : 89

টপিক:১০.৬. আল্লাহকে ভয় করুন, সুদকে না বলুন: 91

একাদশ অধ্যায় :উপসংহার (Conclusion) 100

দ্বাদশ অধ্যায় :গবেষণার সারসংক্ষেপ: 102

টপিক:১২.১. ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক ধারণা ও কাঠামো:.................................. 102

টপিক:১২.২. রিবার সমস্যা ও ইসলামি সমাধান:.. 103

টপিক:১২.৩. তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ: 103

টপিক:১২.৪. বাংলাদেশে এর প্রয়োগযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা: 104

ত্রয়োদশ অধ্যায় :সুপারিশমালা 105

টপিক :১৩.১. সরকারিভাবে ইসলামি অর্থনীতির প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করা: 105

টপিক :১৩.২. শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি: 105

টপিক :১৩.৩. ইসলামি ব্যাংকিংয়ের কাঠামো শক্তিশালী করা: 105

টপিক :১৩.৪. রিবার বিকল্প প্রথাগুলোর প্রয়োগ বৃদ্ধি: 105

টপিক :১৩.৫. আইনি ও নীতিগত সহায়তা: 105

চতুর্দশ অধ্যায় :ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র: 106

টপিক :১৪.১. ইসলামি অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর: 106

টপিক :১৪.২. ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ: 106

১৪.৩. গ্রামীণ অর্থনীতি ও ইসলামি মডেল: 106

১৪.৪. পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থনীতি: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি: 106

১৪.৫. ইসলামী ব্যাংকিং-এর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি: 107

পঞ্চদশ অধ্যায় :গ্রন্থপঞ্জি: 107

প্রথম অধ্যায় :ইসলামি অর্থনীতির ধারণা ও পটভূমি:

টপিক:১.১. ভূমিকা :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। যিনি কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন এবং শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর, যিনি মানবজাতিকে অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে হিদায়াতের আলো দেখিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর পথ অনুসরণ করবেন, তাঁদের উপর।

এই গবেষণা কর্মটি শুরু করছি মহান আল্লাহ তাআলার নামে, যিনি আমাকে এই জ্ঞান অনুসন্ধানের তাওফিক দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন এই সামান্য প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, এর মাধ্যমে উপকার দান করেন, এবং আমাকে ও পাঠকদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের উপায় বানান। আমিন।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। যা মানুষকে সৎ পথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য পথনির্দেশ করে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্পদের আমানতদার। এক্ষেত্রে সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগে হারাম ও হালালের ব্যবধান নিশ্চিত করা হয়। এ অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য যাকাত, ওশর, জিযিয়া ও ছাদাকাতুল ফিৎর ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি,

শোষণ, মজুদদারী, যুলুম প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। সময়ের আবর্তনে এ অর্থব্যবস্থা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হয়েছে। এমনকি এ তাত্ত্বিক বিবরণ (তথ্য-উপাত্তসমূহ) নির্দিষ্ট সময়ান্তে সনাতনী বা দ্রুপদী (Classical) হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোন বিধি-বিধান না থাকায় সমাজে আর্থিক সমতার স্থলে হত-দরিদ্র, নিমণমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যা কোন দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে অক্ষম। সকল অর্থ ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হ’ল সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত অর্থব্যবস্থা সর্বদাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে (Vicious Circle of Poverty) বদ্ধাবস্থায় থাকে। বর্তমানে প্রচলিত অর্থনীতিকে বিজ্ঞানরূপে কেবল তার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক আলোচনা করে, নৈতিক দিক এক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। এ অর্থনীতিতে নিঃস্ব, ফকীর ও অসহায় মানুষের ভোগের প্রাধান্য প্রসঙ্গ হিসাবে আসে না। সম্পদ কুক্ষিগত করার যাবতীয় কৌশলের কথা বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচরণ, বিত্তহীনদের কথা অলোচনায় আসে না। এতে সম্পদই মুখ্য, মানুষ নয়।

ইসলাম সমষ্টিগত কল্যাণ চায়, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর নয়। আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে মূল্যবোধ বিবেচিত হয় না এবং ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যও বিবেচিত হয় না। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙক্ষা ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং কিছু লোকের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে সমাজে আয় বৈষম্য (Income inequality) সৃষ্টি করে, যা ইসলামী অর্থনীতি সমর্থন করে না। ইসলামী অর্থনীতি প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করে এক সর্বোত্তম মানবীয় রূপ দান করেছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী যেমন: উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ, বিনিময়, বাণিজ্যের ধরন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে।

বর্তমান বিশ্বে যেসব অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার ছোট-খাট পার্থক্য বাদ দিলে বলা চলে, মোট তিন প্রকার অর্থব্যবস্থা বিশ্বে চালু আছে। আর তা হ’ল-

(১) ইসলামী অর্থব্যবস্থা

(২) ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা

(৩) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। এখানে ন্যায়বিচার এবং ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। ধনীদের থেকে যাকাতের অর্থ গরীব, অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টনের মধ্যে দিয়ে সমাজের সাম্য অর্জন করা হয়। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এরূপ কোন ধরনের উদ্যোগ নেই। বরং এতে ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। ফলে গরীব লোকেরা মৌলিক চাহিদার প্রথম ধাপ-অন্ন (খাদ্য) দরিদ্রতার জন্য পরিমিতভাবে ভোগ করতে পারে না। এতে বিশ্বে ক্ষুধা নামক নীরব ঘাতকের হাতে প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার লোক মারা যাচ্ছে। ৮৫২ মিলিয়ন লোক ক্ষুধার্ত থাকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BDRI) তথ্য অনুযায়ী দেশের ৫০ শতাংশ পরিবার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে, ২৫ শতাংশ নিয়মিতভাবে সারা বছর খাদ্য পায় না, ১৫ শতাংশ পরিবার সবসময় পরবর্তী খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং ৭ শতাংশ মানুষ কখনোই তিন বেলা খেতে পায় না।

বর্তমানে দেশের ৪০% মানুষ অতিদরিদ্র। প্রায় ২৮% মানুষ এক ডলারের কম আয়ে জীবনযাপন করছে। বিশ্বে প্রতিদিন না খেয়ে থাকে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রতি বছর খাদ্য অপচয় হয় ২২ কোটি টন।প্রচলিত অর্থনীতি এরূপ মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এসবের স্থান নেই। যাদের পণ্য ভোগ করার সামর্থ্য নেই ইসলাম তাদের মাঝে যাকাতের অর্থ ন্যায্য বণ্টনের মধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস করছে। অর্থ-সম্পদ উপার্জনে হারাম-হালাল বিবেচনা, হালাল উৎপাদন, কর্মে নিযুক্ত থাকার নির্দেশ, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি, যাকাত ও ওশর ব্যবস্থার প্রবর্তন, কাপর্ণ্য ও সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সুষম বণ্টন, অপচয় ও অপব্যয় পরিহার, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, সূদ-ঘুষ ও দুর্নীতি নিষিদ্ধ করা, শ্রমনীতি ও শ্রমের মর্যাদা, শোষণমুক্ত সমাজ, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, সমাজকল্যাণ, উত্তরাধিকার আইনের বাস্তবায়ন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতি পন্থা বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে।

টপিক:১.২. ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা:

ইসলামী অর্থনীতি(আরবি:الاقتصاد الإسلامي) হলো কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা।ইসলামী কৃষ্টি ও তামাদ্দুন সমৃদ্ধ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাই ইসলামী অর্থনীতি।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন- "ইসলামী অর্থনীতি হলো জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের যাবতীয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামী অর্থনীতি।"

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন- "ইসলামী অর্থনীতি সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাব"।

ডঃ এম এ মান্নান বলেন- "ইসলামী অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।"

মাওলানা হিফযুর রহমান (র.) বলেন, "শরী'আতের পরিভাষায়, যে বিদ্যা বা জ্ঞানের মাধ্যমে এমন সব উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়; যার দ্বারা ধন-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের উপযুক্ত ও সঠিক পন্থা এবং বিনষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা হয়, তাকে 'ইসলামী অর্থনীতি' (ইলমুল ইকতিসাদ) বলা হয় ।"

সুতরাং, ইসলামী অর্থব্যবস্থা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত অর্থব্যবস্থা। যেখানে ন্যায়বিচার এবং ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়।এবং যার দ্বারা ধন-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের উপযুক্ত ও সঠিক পন্থা এবং বিনষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা হয়। আর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

টপিক:১.৩. ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য:

গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে । বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই ।
মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায় । যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেত না ।

নিচে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

১. আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি:
সব সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ; মানুষ কেবল খলিফা বা পরিচালকের ভূমিকা পালন করে।

২. সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ:
সুদ গ্রহণ ও প্রদান ইসলামে হারাম, কারণ এটি অন্যায় ও শোষণমূলক।

৩. যাকাত ও দানব্যবস্থার গুরুত্ব:
ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ গরিবদের মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনব্যবস্থা:
সম্পদের সুষম বণ্টন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. নিষিদ্ধ ব্যবসা ও পণ্য থেকে বিরত থাকা:

হারাম পণ্য যেমন—মদ, জুয়া, শূকরের মাংস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে।

৬. হালাল উপার্জনের উৎস উৎসাহিত করা:
ইসলামী অর্থনীতি হালাল ও ন্যায়সংগত উপার্জনকেই অনুমোদন করে।

৭. মানবিকতা ও নৈতিকতার ওপর জোর:
ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সততা, বিশ্বস্ততা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা গুরুত্বপূর্ণ।

৮. সম্পদের অপচয় ও সঞ্চয়ে ভারসাম্য:
অপচয় নিষিদ্ধ এবং সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তবে অতিরিক্ত কৃপণতাও নিরুৎসাহিত।

৯. উৎপাদন ও পরিশ্রমের মর্যাদা:
শ্রম, মেহনত এবং উৎপাদনমূলক কাজকে উৎসাহিত করা হয়।

১০. মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগ (প্রফিট শেয়ারিং):
ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকা প্রথা প্রচলিত।

টপিক:১.৪. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার উৎপত্তি :

নিচে বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

টপিক:১.৫. পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্রবাদের (Capitalism) উৎপত্তি হয়। ইংল্যান্ডে ১৭৬০-১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শিল্প বিপ্লবের বিকাশ হ'লেও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের পর এর দ্রুত বিকাশ ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিল্প বিপ্লবের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে বিরাট সম্পদের ও মূলধনের সৃষ্টি হয়, তা মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণীর হাতে থাকার ফলে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। শিল্প বিপ্লবের আগে আধুনিক কলকারখানা না থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। কুটির শিল্পে যে ব্যক্তি উৎপাদক সেই ব্যক্তি শিল্প দ্রব্যের মালিক হওয়ায় শোষণের সম্ভাবনা ছিল না। বিক্রিত মালের মূল্য উৎপাদকই পেত। শিল্প বিপ্লবের ফলে কল-কারখানা স্থাপিত হ'লে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। শিল্প উৎপাদন কারখানাগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়। যাদের হাতে মূলধন ছিল তারা কারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের মুনাফায় ফেঁপে উঠে। এভাবে এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্প-বিপ্লবই আধুনিক ধনতান্ত্রিক ধারণার জননী। বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তেমন পরিচিতি ছিল না।পুঁজিবাদের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় এবং এর বহু বিতর্কিত বিষয় রয়েছে, তবে সাধারণত সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত নিমণ দেশগুলোতে (বর্তমানে ফ্ল্যান্ডারস এবং নেদারল্যান্ড) এবং গ্রেট ব্রিটেনে, ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্থিত বলে মনে করা হয়।

সর্বোপরি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। একই সময়ে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীরা এ অর্থনীতির দৃঢ় প্রবক্তা ও সমর্থক হিসাবে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে

যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ডেনমার্ক, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালী, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

টপিক:১.৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :

'সোস্যলিজম' শব্দটি ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন। জার্মান বংশোদ্ভূত কার্ল মার্কস ও ইংল্যান্ডের অধিবাসী এঙ্গেলস্-এর যুগান্তকারী লেখা 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব জেগে উঠতে শুরু করে। এরই ফলে বিশ্বে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পতন ও লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ 'মাও-সে-তুং' এর নেতৃত্বে চীনেও এ অর্থব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটে। উদ্ভবের পর থেকে সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে।

যেমন উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে,...সমাজতন্ত্র চারটি সময়কাল পেরিয়েছে : প্রথমটি হয়েছিল ঊনিশ শতকে ইউরোপীয় দর্শন (১৭৮০-১৮৫০)। তারপরে ঊনিশ শতকে কর্পোরেশন এবং শিল্পায়ন উত্থানের প্রাথমিক বিরোধী হিসাবে (১৮৩০-১৯১৬) বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্দিকে সমাজতন্ত্রের উৎস এবং সমাজতান্ত্রিক বা সামাজিক গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া (১৯১৬-১৯৮৯); নয়া-উদার যুগে সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া (১৯৯০-)। সমাজতন্ত্রের বিকাশ যেমন হয়েছিল, তেমনি অর্থনীতিতেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল।

সর্বোপরি পুঁজিবাদের শোষণ, সম্পদের বৈষম্য সৃষ্টি, অপরিকল্পিত উৎপাদন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কার্ল মার্কস-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ Das Kapital (Capital) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তাঁর তত্ত্বের আলোকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মতবাদ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে রাশিয়া, চীন, কিউবা, জার্মানী, পোল্যান্ড, উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যামান।

টপিক:১.৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থা :

ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা প্রচলিত অর্থব্যবস্থার মারাত্মক সংকট উত্তরণে একটি সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থা হিসাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয় সাধন করে আদর্শ অর্থনীতির প্রবর্তন করে।

'I originated during the Golden Age of Islam, 622-661 CE, when the Prophet Muhammad and the Rashidun practiced "brotherly cooperation[3] in economics. The ummah operated under the same codes of conduct, and resources were allocated efficiently to ensure a high standard of living.[4] It is believed that as ties to Islam weakened, so did global economic growth in Islamic institutions.ইসলামী স্বর্ণযুগে ৬২২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল, যখন মহানবী (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিতে 'ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহযোগিতা' চর্চা করেছিলেন। উম্মাহ একই আচরণবিধির আওতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং উচ্চ মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ দক্ষতার সাথে বরাদ্দ করা হয়েছিল।এটা বিশ্বাস করা হয় যখন ইসলামের সূচনা ঘটে, তখন ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।(উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি)

দ্বিতীয় অধ্যায় :ইসলামি অর্থব্যবস্থা বনাম অন্যান্য অর্থব্যবস্থা :

টপিক:২.১. বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার সাথে ইসলামি অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা:

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছামত সম্পদ উপার্জন ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জনগণের যথাযথ আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে পলিসি অবলম্বন করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি প্রচলিত অর্থনীতি থেকে যথেষ্ট পৃথক ও ভিন্ন। ইসলামী অর্থব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শুধু মানুষের বস্তুগত জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজনিত ইতিবাচক অর্থনীতিকে (Positive Economics) ব্যাখ্যা করে না, বরং ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত কল্যাণ লাভের জন্যই মানবিক ন্যায়নীতিকেও বিশ্লেষণ করে।

টপিক:২.২. উৎসগত পার্থক্য :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) মানব কর্তৃক সৃষ্ট নিয়ম-কানূন। তাই এক্ষেত্রে ভুল ও সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। এসব নিয়ম-কানূনের কোনরূপ স্থিতি নেই, বরং সর্বদা পরিবর্তন ঘটে।

অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রচিত। তাই এতে কোন ধরনের ভুল বা সন্দেহের অবকাশ নেই।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অর্থ- 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' (বাক্বারাহ ২/২)।

টপিক:২.৩. নীতিমালা ও বিধিবিধান:

প্রচলিত অর্থব্যবস্থা (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র;) মানব সৃষ্ট নিয়ম-কানূন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থা স্থির নয়, বরং সময়ের সাথে সাথে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়ে থাকে। আর নির্দিষ্ট সময়ান্তে ঘরানার তথা সনাতনী বিধি হিসাবে পরিগণিত হয়।

তাই নয়া ক্লাসিক্যাল (Neo-Classical) অর্থনীতিবিদের জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বলেন, 'Economic laws are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact laws of gravitation.অর্থনীতির নিয়মগুলো মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ ও যথাযথ নিয়মের তুলনায় জোয়ার-ভাটার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার নিয়ম-কানূন চিরন্তন সত্য এবং স্থির, যা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ

অর্থ-"আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।"[৬:১১৫] আল আনআম,১১৫।

টপিক:২.৪. সম্পদের মালিকানা :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের সর্বময় সিদ্ধান্ত ব্যক্তিমালিকানায় বিদ্যমান। এখানে দরিদ্র, অসহায়, ফকীর শ্রেণীর লোকের কোনরূপ কল্যাণকর দিক নির্দেশ করে না। বরং ধনীরা আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। উপকরণের মালিকানা কোন ব্যক্তির হাতে থাকে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অর্থনৈতিক সব সিদ্ধান্তের কার্যক্রম গৃহীত হয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তির মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা রাষ্ট্রীয় একনায়কত্বের নিকট দলিত-মথিত হয়।

পক্ষান্তরে বিশ্বজগতের একক ও নিরঙ্কুশ মালিকানা মহান আল্লাহর। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ পার্থিব সম্পদের উপর সাময়িক ও শর্তসাপেক্ষে অধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলামের এই নীতি বাস্তবায়ন হ'লে সম্পদের সুষম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ্ বলেন,

অর্থ-'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর'।(বাক্বারাহ ২/২৮৪)।(আয়াতের অংশ)

টপিক:২.৫. জীবন পদ্ধতি :

পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হওয়ায় সমাজে শ্রেণী সংঘাত উপস্থিত হয়। ধনী-গরীবের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ সম্ভব হয় না। সমাজতন্ত্রেও তথাকথিত সর্বহারার একনায়কত্ব দেখা দেয়। তাই এ অর্থব্যবস্থায়ও শ্রেণী সংঘাত বিদ্যমান।

অন্যদিকে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ শুধু সম্পদের আমানতদার হিসাবে সর্বক্ষেত্রে মানবিক সৎ গুণাবলীর চর্চা করে। তাই এখানে শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয় না।

পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ বলেন,

সূরা আন-নূর (২৪:৩৩)(আয়াতের অংশ:)

وَآتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ

অর্থ:"তোমাদেরকে যা আল্লাহ্ দিয়েছেন, তা থেকে আল্লাহর সম্পদ হিসেবে তাদেরকে দাও।"

ব্যাখ্যা:

এই আয়াতে আল্লাহ বলেন, সম্পদ মূলত তাঁর, মানুষ কেবল অমানতদার। ইসলামী অর্থব্যবস্থার এই মূলনীতি শ্রেণীসংঘাত কমিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

টপিক:২.৬. ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা :

পুঁজিবাদে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা নেই। আর সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি থাকলেও রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা থাকে না। অপরপক্ষে ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি ও স্বাধীনতা আছে।

পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ বলেন,
সূরা আল-বাকারা (২:২৮৬)আয়াতের অংশ:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অর্থ:"আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব আরোপ করেন না।"

ব্যাখ্যা:
এই আয়াতটি ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।
এটি প্রমাণ করে যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কারো উপর অযৌক্তিক কর, সুদের বোঝা বা শোষণ চাপায় না।
এর মাধ্যমে মানুষ নৈতিকভাবে মুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, এবং আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়।

টপিক:২.৭. উৎপাদনের লক্ষ্য :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন করা। আর সমাজতন্ত্রে সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি সাধন করার লক্ষ্যে উৎপাদন করা হয়।
কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন করা হয় সমস্ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ,

'আর তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল' (যারিয়াত ৫১/১৯)।

এজন্য ইসলাম গরীব, অসহায় ও নিঃস্ব, যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকে।

টপিক:২.৮. উৎপাদন পদ্ধতি :

পুঁজিবাদে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব রয়েছে বিধায় তারা যে কোন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে। এমনকি জনগণের জন্য ক্ষতিকর যেমন: মদ, গাঁজা, আফিম, হিরোইন, ইয়াবা প্রভৃতি উৎপাদন পুঁজিবাদে হতে পারে।সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানায় কোন উৎপাদন হ'তে পারে না। তাই ব্যক্তিগত উৎপাদনের স্বাধীনতা এ অর্থব্যবস্থায় নেই।
অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগও বজায় থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন চলবে, যখন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষতিকর প্রমাণিত না হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে উৎপাদন পরিচালিত হয়।

টপিক:২.৯. ভোক্তার সার্বভৌমত্ব :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তা স্বীয় উপযোগ সর্বোচ্চকরণের জন্য যে কোন পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা ভোগ ও ক্রয় করতে পারে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে ভোক্তা তার উপযোগ সর্বোচ্চকরণের নিমিত্তে যে কোন পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা ভোগ ও ক্রয় করতে পারে না। কারণ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নিজের ইচ্ছাকে ভোক্তার উপর চাপিয়ে দেয়। ফলে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে চলতে হয়। তবে ব্যক্তি বা ভোক্তা আল্লাহর বিধান মতে পরিমিত পরিমাণ হালাল পণ্য উৎপাদন ও ভোগের স্বাধীনতা লাভ করে।

আল্লাহ্ বলেন, ‘তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করেনা বা কৃপণতা করেনা। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে’ (ফুরক্বান ২৫/৬৭)।

টপিক:২.১০. জীবিকা অর্জন :

প্রচলিত অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) জীবিকা নির্বাহের জন্য সৎ কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাই ব্যক্তি অপরাধ বা অন্যায়মূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু ইসলামে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (জুম‘আ ৬২/১০)।

নবী করীম (সাঃ) বলেন, ‘নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন’।

তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেয়া কারো নিকট চাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ দিতেও পারে, নাও দিতে পারে'।

টপিক:২.১১. সম্পদের বণ্টন :

পুঁজিবাদে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত না হওয়ায় সমাজে ধনী ও গরীবদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ফলে ধনীরা গরীবদের শ্রম শোষণ করে আরো ধনী হয় এবং গরীবেরা আরো গরীব হয়। বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) প্রতিবেদনে বিশ্বের ১০১টি দেশের মারাত্মক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিবেচনা করা হয়। এসব দেশের মধ্যে ৩১টি নিমণ আয়ের, ৬৮টি মধ্য আয়ের এবং দু'টি উচ্চ আয়ের দেশ। এসব দেশের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ বহুমাত্রিকভাবে দরিদ্র।[22] সমাজতন্ত্রে শ্রমিকের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী সম্পদ বণ্টিত (Distribution according to amount and quality of work) হয়। এর ফলে মজুরী এক হয় না। তাই এ ব্যবস্থায় শোষণ না থাকলেও আয় তথা সম্পদ বণ্টনে অসমতা আছে।

পক্ষান্তরে ইসলামে ন্যায়বিচার ও ইনছাফপূর্ণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এ লক্ষ্যে যাকাত এবং ওশর-এর অর্থ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ধনী এবং গরীবের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য দূর হয়, যা অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিক কল্যাণ বয়ে আনে।

টপিক:২.১২. বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিকার :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা অমুসলিম নাগরিকের ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। তাই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু ইসলাম অমুসলিম নাগরিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

টপিক:২.১৩. সুদের লেনদেন :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) সূদের লেনদেনকে বৈধ বিবেচনা করে এর সম্প্রসারণের প্রয়াস চালানো হয়। সূদ প্রথা সমাজে ধন বৈষম্যের জন্ম দেয়, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে না। ১৯৩০ সালের মহামন্দার মূল কারণও ছিল সূদের হার।

কিন্তু ইসলামে সূদকে বর্জন করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে আর্থিক পুঁজিকে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও আয় সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ সূদের সাথে শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনা প্রভৃতি অশুভ বিষয় সম্পৃক্ত থাকে।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ আছে, আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন" (বাক্বারাহ ২/২৭৫)।

আরও বলা হয়েছে সূরা আল-বাকারা (২:২৭৮-২৭৯)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ

ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূত্তাকুল্লাহা ওয়াযারূ মা বাকিয়া মিনার-রিবা ইন কুন্তুম মুমিনীন।
ফাইল্লাম তাফ‘আলূ ফা’যানূ বিহারবিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া রাসূলিহি।

অর্থ:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বাকি রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

আর যদি তোমরা তা না কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।”

— (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৮-২৭৯)

জাবির (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন'।(সহীহ মুসলিম – হাদীস নম্বর: ১৫৯৮)

টপিক:২.১৪. সামাজিক নিরাপত্তা :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা নেই। এ অর্থনীতিতে পুঁজিবাদীই অর্থনৈতিক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে জনগণের ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকলে তাকে অভুক্ত থাকতে হয়।

সমাজতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এখানে জনকল্যাণমূলক ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয় দ্বারা মজুরী তহবিল (wage fund) এবং গণভোট তহবিল (public consumption fund) গঠন করা হয়।

অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামী অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' (বাক্বারাহ ২/১৮৮)।

তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' (নিসা ৪/২৯)।

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তাও ভালো। আর যদি গোপনে দরিদ্রদের দাও, তবে তা অধিকতর ভালো। এমনটি করলে তোমাদের বহু পাপ মুছে দেয়া হবে। তোমরা যাই করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত' (বাক্বারাহ ২/২৭১)।

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস (জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও ভুলে থেকো না। (মানুষের) কল্যাণ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর (অর্থ সম্পদ দ্বারা) দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না' (ক্বাছাছ ২৮/৭৭)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, (স্রষ্টার পক্ষ থেকে) তার প্রতি দয়া করা হবে না'।(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬০১৩,সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৩১৮)

তিনি আরো বলেন, 'বান্দা ততক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ ঐ বান্দার সাহায্যে থাকেন'।(সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৬৯৯,তিরমিযি: হাদীস ১৯৪৯)

টপিক:২.১৫. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বৈরী মনোভাব গড়ে ওঠে। কারণ মালিকের হাতে সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকায় শ্রমিক তার পরিশ্রমের তুলনায় কত মজুরী পায়। অর্থাৎ মালিক শোষকের ভূমিকায় এবং শ্রমিক শোষিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।
সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শ্রমিকরা যাতে সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে তার দিকে নযর দেয় না। এক্ষেত্রে মূল্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং মজুরী রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তাই সমাজতন্ত্রে সামরিক কায়দায় উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। সেখানে শ্রমিককে পশুর মতো ব্যবহার করা হয়।
অপরদিকে ইসলামই সর্বপ্রথম শ্রমিককে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামী শ্রমনীতিতে মালিক, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক পরস্পর ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অর্থনীতিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে এবং কোন উৎপাদনশীল কর্মকান্ড হ'তে প্রাপ্ত মুনাফা মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, মানুষ তাই (পরিশ্রম) পায় যা সে করে' (নাজম ৫৩/৩৯)।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।'
(সুনান ইবন মাজাহ:২৪৪৩)

টপিক:২.১৬. মজুরী নির্ধারণ :

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় মজুরী নির্ধারিত হয় বাজার শক্তি, চাহিদা ও উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা উপেক্ষিত হয়।
সমাজতন্ত্রে মজুরী নির্ধারিত হয় শাসক ও আমলা শ্রেণী কর্তৃক। যা শ্রমিককে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করতে হয়।
কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে বাজার শক্তি ও জীবনযাপনের মানভিত্তিক মৌলিক চাহিদার সমন্বয়ে মজুরী নির্ধারিত হয়।
মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দন্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে’ (হাদীদ ৫৭/২৫)।
তাই শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে; যাতে শ্রমিক তার প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়।

নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দন্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

টপিক:২.১৭. যাকাত :

প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) যাকাতের কোন স্থান নেই।

কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক। যাকাত ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ভাষ্যমতে, পবিত্র কুরআনে ৩২ বার যাকাতের কথা এসেছে। এর মধ্যে ছালাত ও যাকাতের কথা একত্রে এসেছে ২৮ বার। ফুওয়াদ আবদুল বাকী বর্ণনা করেছেন, কুরআনে মোট ১৯টি সূরায় ২৯টি আয়াতে যাকাত শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। যাকাত ছাড়া ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনো সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনে যাকাত যেমন প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও তার বিকল্প নেই।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও' (বাক্বারাহ ২/৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭; নিসা ৪/৭৭, ১৬২; নুর ৫৬; আহযাব ৩৩; মুজ্জাম্মিল ২০)।

যাকাতের অর্থ গরীব, অসহায়, ফকীর, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকের মধ্যে বণ্টন করলে ধনী-গরীবেব মধ্যে সম্পদের বৈষম্য থাকে না।

টপিক:২.১৮. রাষ্ট্রের ভুমিকা :

পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা যৎসামান্য।
সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা একমাত্র রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রীয় নির্দেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত বিধান রাষ্ট্র যাতে কারো প্রতি যোর-জবরদস্তি করার বিধান নেই।

টপিক:২.১৯. রাজস্ব ব্যবস্থা :

প্রচলিত অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্র) রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং করই হচ্ছে এর মোক্ষম উপায়।
অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতির রাজস্ব ব্যবস্থারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আয়ের সুষম বণ্টন এবং গরীব, অসহায় ও নিঃস্ব লোকেদের মধ্যে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যাকাত, ওশর, সাদাকায়ে ফিতর প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয় অধ্যায় : রিবা (সুদ) ধারণা,প্রকারভেদ ও অবস্থান:

টপিক:৩.১. রিবার সংজ্ঞা :

রিবা এর আভিধানিক অর্থঃ বৃদ্ধি, আধিক্য, পরিবর্ধন, বেশি, স্ফীত, বিকাশ ইত্যাদি। যা উশুরি হিসেবেও পরিচিত।

রিবা একটি আরবি শব্দ। যা ইসলামি পরিভাষায় সুদকে বোঝায়।

ইসলামি শরিয়াহ মতে, লেনদেনের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তানুযায়ী শরীয়াহ সম্মত কোনোরুপ বিনিময় ব্যতীত মূলধনের উপর অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে।

ফিকহবিদদের পরিভাষায়:

الزيادة في أشياء مخصوصة.

“নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে রিবা বলা হয়”।

অথবা

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

“তা এমন এক বিশেষ বিনিময় চুক্তি; যা সংঘটিত হওয়ার সময় শরী‘আতের মাপকাঠি অনুযায়ী সমতা বিধান করা হয় নি। অথবা তা এমন এক বিশেষ বিনিময় চুক্তি; যাতে উভয় জিনিস বাকীতে বা একটি জিনিস বাকীতে বিনিময় করা হয়েছে”।

সুতরাং

রিবা (সুদ) হল কোনো অতিরিক্ত অর্থ যা মূলধনের বিনিময়ে ধার দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট শর্তে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী পরিভাষায়, এটি এমন একটি আর্থিক লেনদেন, যেখানে নির্দিষ্ট সময় পরে ফেরত দেওয়ার শর্তে মূল টাকার উপর অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়—যা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী হারাম বা নিষিদ্ধ।

উদাহরণ: কেউ ১০,০০০ টাকা ধার দিয়ে বলে যে এক মাস পর ১১,০০০ টাকা ফেরত দিতে হবে—তাহলে ওই ১,০০০ টাকা হলো রিবা বা সুদ।

টপিক:৩.২. ইসলামের আলোকে রিবার পরিচয়:

আরবি ভাষায় সুদের প্রতিশব্দ রিবা। বাংলা ভাষায় 'সুদ' শব্দটি যেমন পরিচিত- তেমনি আরবি ভাষায়ও 'রিবা' শব্দের ব্যবহার বহুল প্রচলিত।
রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলি যুগেও 'রিবা' শব্দের প্রচলন ছিল।ইসলামে সুদ হারাম।সে সময় সুদের লেনদেনও চালু ছিল।
সুরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হজরত মুসা (আ.)-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের প্রচলন ছিল এবং মুসা (আ.)-এর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব তাওরাতেও 'রিবা' অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের প্রচলন ছিল, পবিত্র কোরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কোরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার বাস্তবতা বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল-

كل قرض جر نفعا فهو ربا

অর্থ: যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।
ইসলামে সব ধরনের সুদ হারাম।
এ কারণে অষ্টম হিজরিতে সুরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাজিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তারা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তারা অকপটে মেনে নিয়ে সব ধরনের সুদি লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইসলামে রিবা'র নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে কেবল নৈতিক বিবেচনার অধীনে রাখেনি; বরং তাকে পুরোপুরি আইনের মর্যাদা দিয়েছে।

এ বিষয়ে বিদায় হজ্বে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহাসিক ভাষণের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلَا كُلّ شَيْءٍ مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ،... وَرِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ

অর্থ: সাবধান! জাহেলিয়্যাতের প্রত্যেক বিষয় আমার দু'পায়ের নিচে।... জাহেলি যুগের 'রিবা' বাতিল। (মুসলিম: ১২১৮)

টপিক:৩.৩. রিবার প্রকারভেদ:

নিম্নে আলেম,ইসলামি চিন্তাবিদ,অর্থনীতিবিদ &আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতামতে ভিত্তিতে বিরা বা সুদ এর প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো:

টপিক:৩.৪. আলেমদের মতে সুদের প্রকারভেদ:

আলেমদের কাছে রিবা বা সুদ দু’ধরণের। তা হলো:

১- রিবা নাসীয়া

২- রিবা ফদল

১- রিবা নাসীয়া: ‘নাসীয়া’ শব্দের অর্থ বাকী ও বিলম্বের সুদ। সুদসহ ঋণ ফেরত দিতে বিলম্বের বিনিময়ে ঋণ ও ঋণের সুদের ওপর অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করা। একে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ (রিবা বিল-আজাল) বলা হয়।

২- রিবা ফদল: শাব্দিক অর্থে ফদল (অতিরিক্ত) শব্দটি নকস (কমতি) এর বিপরীত। পারিভাষিক অর্থে, একই জাতীয় দু’টি জিনিসের মধ্যে একটির বিনিময়ে অতিরিক্ত নেওয়া। যেমন, স্বর্ণের পরিবর্তে সমপরিমাণ স্বর্ণ না নিয়ে অতিরিক্ত স্বর্ণ গ্রহণ করা, এমনিভাবে গমের পরিবর্তে অতিরিক্ত গম নেওয়া ইত্যাদি যেসব জিনিসে প্রচলিতভাবে সুদ হয়ে থাকে। একে বেচাকেনার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ (রিবা আল-বাই‘) বা গোপন সুদ (রিবা আল-খফী) ও বলা হয়।

শাফে‘ঈ মাযহাবের লোকেরা তৃতীয় আরেক প্রকারের সুদের কথা বলেছেন, তা হলো ‘হস্তগত করার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ’ (রিবা আলইয়াদ)। অর্থাৎ মূল্য ও বস্তু অথবা দু’টির যেকোনো একটি নগদ গ্রহণ না করে বিলম্বে গ্রহণ করা।

কেউ কেউ চতুর্থ আরেক প্রকারের সুদের কথা বলেছেন, তা হলো ঋণ সম্পৃক্ত সুদ (রিবা আলকারদ্ব)। আর তা হলো, বেচাকেনার মধ্যে কোনো উপকারের শর্তারোপ করা।

তবে এসব (তৃতীয় ও চতুর্থ) প্রকার সুদ প্রকৃতপক্ষে আলেমদের বর্ণিত উপরোক্ত প্রকারভেদের বাইরে নয়। কেননা তারা যাকে ‘হস্তগত করার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ’ (রিবা আলইয়াদ) বা ‘ঋণ সম্পৃক্ত সুদ’ (রিবা আলকারদ্ব) বলা হয়েছে তা উপরোক্ত দু’প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

টপিক:৩.৫. অর্থনীতিবিদ ও আধুনিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে রিবা:

অর্থনীতিবিদরা সুদকে আরও দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। তা হলো:
১.দ্বিগুণ সুদ (মুদ্বা'আফ)
২.সামান্য সুদ (বাসীত)

১- দ্বিগুণ সুদ (মুদ্বা'আফ): যে লেনদেনে সুদের পরিমাণ অনেক বেশি।

২- সামান্য সুদ (বাসীত): যে লেনদেনে সুদের পরিমাণ অনেক কম থাকে।
ইসলাম সব ধরণের সুদের কারবার হারাম করেছে, চাই তা রিবাল ফদল বা রিবা নাসীয়া হোক, এতে সুদের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, ক্ষয়প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যে হোক বা উৎপদনশীল কাজে নিয়োজিত হোক। উপরোক্ত সব প্রকারের সুদ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة :٢٧٥]

"অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

আধুনিক চিন্তাবিদরা সুদকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। তা হলো:
১.ক্ষয়িষ্ণু সুদ (ইসতিহলাকি) ও
২.উৎপাদনশীল বর্ধিষ্ণু সুদ (ইনতাজি)

১- 'ক্ষয়িষ্ণু সুদ' (ইসতিহলাকি) হচ্ছে, খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ধ্বংসশীল খাদ্য-দ্রব্য ও ঔষধপত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে নেওয়া ঋণের ওপর প্রদত্ত অতিরিক্ত সুদ।
২- 'উৎপাদনশীল বর্ধিষ্ণু সুদ' (ইনতাজি) হচ্ছে: উৎপাদন কাজে ঋণের ওপর নেওয়া অতিরিক্ত সুদ। যেমন, ফ্যাক্টরি বানানো বা চাষাবাদ বা ব্যবসায়িক কাজে ঋণ নেওয়া

টপিক:৩.৬. কুরআন ও হাদীসে রিবার নিষিদ্ধকরণ:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীরে কবীরের আলোকে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থ: যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে নিয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে। এর কারণ হল, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয় তাহলে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। আর যারা পুনরায় এটি করবে তারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে। সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সুদখোর মানুষ এবং সুদখোর জাতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনিষ্টের বা অপকারিতার উল্লেখ করেছেন। যার ফলে, কেবল ধনী-গরীবের মাঝে বিশাল ব্যবধানইসৃষ্টি হয় না বরং বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলাও বিনষ্ট হয়। এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত,এ স্থলে 'রিবা' শব্দের মাঝে সব ধরনের সুদ অন্তর্ভুক্ত। এতে ব্যাংক-কে পৃথক রাখা হয় নি। অতএব, ব্যাংক থেকেই সুদ নেয়া হোক বা ডাকবিভাগ ও সমবায় সমিতি কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ থেকেই সুদ নেয়া হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই এই সুদ ভোগ করা অবৈধ বা হারাম। কিন্তু পরিতাপ, এযুগে মুসলমানরা ইউরোপিয়ান দেশগুলোর ভয়ে ভিত হয়ে সুদের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করে দিয়েছে।

কিছু লোক বলে, একশ' টাকা দিয়ে দুইশত টাকা নেয়া- এ ধরণের সুদ ইসলামে নিষেধ। তবে, সামান্য সুদ গ্রহণ বা ভোগ করা নিষেধ নয় কেননা, এটি সুদ নয় বরং মুনাফা বা লভ্যাংশ।

এ ধরনের লোকদের উদাহরণ সেই কাশমিরী ব্যক্তির ন্যায়, যাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল,

তোমার কি কোন পুত্র-সন্তান আছে?

সে উত্তরে বলল, কোন সন্তান নেই।

কিন্তু যখন সে দাঁড়ালতখন চার-চারটি পুত্র-সন্তান তার লম্বা জুব্বার নিচ থেকে বেরিয়ে এল।

প্রশ্নকারী তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি না বলেছিলে, তোমার কোন পুত্র নেই, তাহলে এই চার সন্তান কার?

সে উত্তরে বলল, চার-পাঁচটি সন্তানকে আবার সন্তান বলে নাকি? (অর্থাৎ দেড়-দু'ডজনের কম সন্তানকে তারা সন্তানই মনে করে না-অনুবাদক)

ঠিক একইভাবে এসব লোকেরাও বলে যে, পাঁচ শতাংশ বা সাত শতাংশ সুদ কোন সুদ হল নাকি! একশ' শতাংশ সুদ হলে পরেই সেটিকে সুদ বলা যায়। অমুসলিমদের কাছ থেকে সুদ নেয়া বৈধ- এই ফতোয়া দিয়ে অপর কিছু লোক সুদ বৈধকরণের পথ বের করে নিয়েছে।

অনেকে আবার এই ফতোয়াও দিয়েছে, অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীন বসবাসরত মুসলমানদের কাছ থেকেও সুদ গ্রহণ করা বৈধ। এমনকি এটিও বলাহয়েছে, অনেক বড় অংকের সুদকেই মূলত সুদ বলে কিন্তু এই অংকটি আসলে কত তা নির্দিষ্ট করা হয় নি।

একথায়, সুদ গ্রহণে কারো জন্যই এমতাবস্থায় আর কোন বাধা রইল না। সবার জন্য সুদ গ্রহণ বৈধ হয়ে গেল।

অথচ **মহানবী (সা.) সুদকে এমন লানত আখ্যা দিয়েছেন যে, একবার তিনি (সা.) বলেছেন, সুদগ্রহীতা, সুদদাতা এবং এর স্বাক্ষ্যদানকারী সবাই জাহান্নামে যাবে।**

আসলে, সুদ নিষিদ্ধকরণ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাসমূহের অন্যতম। কেবল কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হবে আর অন্যরা অভুক্ত মারা যাবে- ইসলাম এটি চায় না। বরং ইসলাম চায়, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের প্রতিযোগিতায় সবাই যেন সমভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং সমাজ যেন সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্য সব ধরনের সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা আবশ্যক। কেননা, সুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বা অপকারিতা হল, সম্পদশালী এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে ক্রমশ সব ধরনের ব্যবসা, শিল্প-কারখানা নিজ করায়ত্বে নিয়ে নেয় আর অন্যরা তাদের করুনা ও দয়ার পাত্র হয়ে যায়।

অতএব, এযুগে সুদ-ই হল সেই ব্যবস্থাপনা যা গুটিকতক মানুষের হাতে সকল সম্পদ কুক্ষিগত করে দিয়েছে। ফলে, ধনী-দরিদ্রের মাঝে এক বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে।

টপিক:৩.৭. বিভিন্ন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সুদের অবস্থান

বিভিন্ন ধর্ম,সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা & সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রচিন্তাবিদ,ইসলামি চিন্তাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নে সুদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হলো:

টপিক:৩.৮. ইহুদি ধর্মে সুদ:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন:

বস্তুত:" আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"...[সূরা আন-নিসা: ১৬০-১৬১]

বস্তুত: ইয়াহুদীদের জন্যে আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্যে হালাল ছিল, তাদের পাপের কারনে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমানে বাধা দেয়ার দরুন। আর এ কারনে যে তারা সুদ গ্রহন করত। অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারনে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায় ভাবে।

ইহুদিরা সেই আদিকাল থেকেই অন্য ধর্মের অনুসারীদের উপর জুলুম ও শোষণকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধেও নানা কুৎসিততা ছড়ায়। তারা সেদিন ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র সুদে ঋণদাতা ব্যাবসায়ী কৌশলকে আজ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাদের এ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। তারা ঘোষণা করেছে সুদ খাওয়া বৈধ।

তাদের ইহুদি ধর্মগ্রন্থেও তারা এই বিষয়ে উক্তি করেছে। যেমন–

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا – النساء : ١٦٠-١٦١

"মুহতাজ অবস্থায় মুসলমান মুমিনদের কাছ থেকে সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করার হুকুম করে, না তাদের মধ্যে যারা হুকুম করে তারা এবং তাদের অনুসারীরা এটা গ্রহণ করে।
এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর উত্তম খাদ্যবস্তুগুলো হারাম করেছেন, তারা যেসব হারামকে হালাল করেছে তার কারণে, তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় অধিকাংশ লোককে বাধা দিয়েছে এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে।"

টপিক:৩.৯. খ্রিস্টান ধর্মে সুদ:

খ্রিস্টান ধর্মেও সুদ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। তবে ঘবি-এর একটি বিশেষ স্থানে সুদের সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। এর ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। অনেকের মতে, বাণিজ্যিকভাবে সুদের সমর্থন এখানে নেই।

টপিক:৩.১০. হিন্দু ধর্মে সুদ:

হিন্দু ধর্মে সুদের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। ১৫০০০ খ্রি. পূ. পুরনো হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ ‘বেদ’-এ সুদের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদের প্রকৃতি বর্ণনায় বেদে বলা হয়েছে যে, এটি যে কোনো ধরনের ধার প্রদান প্রক্রিয়া যেখানে (অর্থের জন্য) অতিরিক্ত লাভ নেয়া হয়।
খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-এর দিকে হিন্দু আইনবিদ বৌধায়ন সুদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। গরিব লোকদের ধার দিয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যে উচ্চহারে লাভ হিসেবে অর্থগ্রহণ করে তিনি সে প্রক্রিয়াকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন।
কিন্তু হিন্দু ধর্মীয়-সামাজিক জীবনে সুদের প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয়নি।
দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দু জগতে একটি সহনীয় মাত্রায় সুদ গ্রহণ বৈধ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

টপিক:৩.১১. বৌদ্ধ ধর্মে সুদ:

বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সুদ অবৈধ বলে বিবেচিত। গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্য আটটি পথ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) নির্ধারণ করেছেন। এ আটটি পথের মধ্যে অন্যতম হলো 'সম্যক আজীব' বা সঠিক জীবিকা অর্জন। জীবিকা অর্জনের যথার্থ পন্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ কিছু বিষয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তার মধ্যে সুদ গ্রহণ অন্যতম। আরবি 'রিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, যুক্ত হওয়া অথবা বাড়তে থাকা। শব্দগত অর্থে 'রিবা' বলতে কেবল ধারের টাকার ওপর নির্ধারিত মুনাফা বা লভ্যাংশ নেয়া বোঝায় না; বরং যে কোনো অবৈধ বা বেআইনি উপায়ে বা অন্যকোনো ধরণের অশুভ সুবিধা ভোগের মাধ্যমে মূলধনের পরিমাণ বা আকার বৃদ্ধি করা রিবার আওতাভুক্ত।

টপিক:৩.১২. ইসলাম ধর্মে সুদ:

ইসলামী ভাবধারা অনুসারে রিবা বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া বাড়তি অর্থসহ তার কাছ থেকে মূল অর্থ আদায় করা। কোরআন ও হাদিসে যে কোনো ধরনের রিবাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই সুদকে ব্যবসার সঙ্গে একাত্ম করে দেখা এবং সুদের কারবার করা ইসলামী সংস্কৃতিতে নিষিদ্ধ কর্ম বলেই বিবেচিত হয়।

সুদ বাংলা ভাষায় ব্যবহার হলেও এর উৎপত্তি ফার্সি থেকে। একে আল কোরআনে বলা হয়েছে 'রিবা'। যার অর্থ-বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ইসলামে সব বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়নি; বরং কেবল সেই বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়েছে, যা প্রদত্ত ঋণের আসলের ওপর ধার্য ও আদায় করা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে মানুষ অর্থ ঋণ বা ধার দিত, অতঃপর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে পূর্বচুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত, অথচ আসল অপরিবর্তিত থাকত। অনেকে পণ্যসামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং অতিরিক্ত পণ্য ও শস্যসহ আসল ফেরত নিত। তদানীন্তন আরবে আসল ঋণের ওপর ধার্য ও আদায়কৃত এই অতিরিক্ত অর্থ, পণ্য বা শস্যের পরিমাণকে বলা হতো 'রিবা'।

আল কোরআনে এই 'রিবা'কে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুদ মূলত অর্থনীতির সবচেয়ে প্রাচীন ও জটিল সমস্যা এবং শোষণের হাতিয়ার, যা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মেরুদণ্ড। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির পথে সুদ প্রধান বাধা। মিসর, গ্রিস, হয়েছে। **আর আল কোরআন বলে, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন (সূরা বাকারা)।**

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সবার ওপর লা'নত দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী (মুসলিম)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সুদের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাজা)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না। (সূরা বাকারা)।

আরবের জাহিলি যুগে সুদের অর্থকে সাধারণভাবে অপবিত্র মনে করা হতো। ইউরোপীয় দেশগুলোতে ধর্ম ও আইনের চোখে সুদ নিষিদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ বলে গণ্য হতো। লন্ডনের অধিবাসীরা সুদখোর ইহুদিদের শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে মধ্যযুগে বহু ইহুদিকে হত্যা করেছিল। জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে প্রথম এডওয়ার্ড ১২৯০ সালে ব্রিটেন থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন। সেই সঙ্গে সুদের ব্যবসাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

ইসলামের অনেক নিষিদ্ধ কাজের অন্যতম হলো সুদ। সুদের ভয়াবহতা অনেক বেশি। সুদের কারণে ব্যাপক সামাজিক অরাজকতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"সুদের তিয়াত্তরটি শাখা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাখাটি হলো, কেউ নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার সমতুল্য। আর সবচেয়ে বড় সুদ হলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের

সম্মানহানি করা।" ইবনু মাজাহ: হাদিস নং ২৩০৪ ও ২৩০৫,মুসনাদে আহমাদ: হাদিস নং ২১৯৫৯,আল-হাকিম: সহীহুল

জামে', হাদিস নং ৩৫৩৩

অন্য এক হাদিসে আছে, সুদ খাওয়ার জন্য কোনো অজুহাত ও ছলছাতুরী করা যাবে না। এ রকম লোকদের আল্লাহ পাক হাশরের মাঠে কুকুর ও শূকর বানিয়ে দেবেন।
বনি ইসরাইলের লোকদের জন্য শনিবার মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। একদল লোক চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মাছ ধরার নিয়তে শনিবার জলাশয়ের পাশে বড় গর্ত খুঁড়ে রাখত। গর্তে মাছ জড়ো হলে রোববার তা শিকার করত। আর বলত, 'আমরা তো নিয়ম ভঙ্গ করিনি।' এ চালাকির জন্য আল্লাহপাক তাদের বানর ও শূকরে পরিণত করেছিলেন। যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ সেটা কোনোভাবেই জায়েজ করা যাবে না।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার এবং তোমরা সেই আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের দয়া করা হয়।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩০-৩২)।

আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে সুদের ব্যবসা চলছে। একেক স্থানে একেক নামে। বিশেষ করে দেশের চরাঞ্চলে দাদন ব্যবসা হিসেবে। গরিব চাষিরা বিপদে পড়ে মহাজনদের কাছ হতে চড়া সুদে ঋণ নেয়। পরে আর সেটা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এভাবে সে তার ভিটেমাটি পর্যন্ত হারায়। বাড়তে থাকে দরিদ্র লোকের সংখ্যা আর সম্পদশালী হয় মহাজনরা। এত গেল একেবারে নিম্নবিত্তদের দৃষ্টান্ত। একটু ওপরে তাকাই! অনেকে বোনের বিয়ে, ছেলের বিদেশে যাওয়া, মায়ের চিকিৎসা ইত্যাদি কারণেও মোটা অঙ্কের ঋণ নেয়। পরে সেটার জন্য শুধু সম্বলহীনই হয় না, অনেকে মামলার শিকার হয়ে কারাবরণ করে। এটাই বাস্তবতা। সুদ মানুষকে শোষণ করে, সমাজ থেকে ভাইয়ে ভাইয়ের বন্ধন কেড়ে নেয়। সমাজের দরিদ্র মানুষদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সুদ কাজ করে। এজন্য ইসলামে শুধু সুদ গ্রহণকেই নয়, সুদ প্রদান করাকেও হারাম বলা হয়েছে। কারণ সুদ সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে।

টপিক:৩.১৩. সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ:

কার্ল মার্কস সুদের ব্যবসায়ীকে ‘বিকট শয়তান’ নামে অভিহিত করেছেন। সুদখোরকে তিনি তুলনা করেছেন ডাকাত ও সিঁদেল চোরের সঙ্গে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সুদ ‘শ্রমিক সমাজের ওপর একটি অসহনীয় বোঝা’। এটি ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিবে পরিণত করে।

লর্ড কিনস **১৯৩৩** সালে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলার জন্য সুদের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রস্তাব করেন।

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই সুদের বিরোধী। সুদের অভিশাপে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আধুনিক দুনিয়ার শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সুদ সমাজে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলছে। সম্পদ ও দায়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা পালন করছে দক্ষ ও কুশলী ভূমিকা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের গুরুভার কঠিন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। সুদের এ অভিশাপ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে, সুদের উচ্চহারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

সুদের বৈশিষ্ট্য হলো ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋণের আসল বৃদ্ধির সীমা বা পরিমাণ বা হার পরিবর্তন হওয়া ও অতিরিক্তের জন্য কোনো বিনিময় না দেয়া। সুদ দুই ধরনের। যথা- নাসিয়া ও ফদল। সাধারণত ঋণের ক্ষেত্রে ‘রিবা নাসিয়া’র উদ্ভব হয়। ঋণদাতা কোনো অর্থ বা পণ্য ঋণ হিসেবে দেয়ার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের ব্যবধানে পূর্বনির্ধারিত হারে বা পরিমাণে ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তাকে বলা হয় ‘রিবা নাসিয়া’। আর সমজাতীয় দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে ‘রিবা ফদল’-এর উদ্ভব হয়। কোনো দ্রব্যের সঙ্গে একই জাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণ বিনিময় করলে দ্রব্যের ওই অতিরিক্ত পরিমাণকে ‘রিবা ফদল’ বলা হয়। ‘মুনাফা’ আরবি শব্দ, যার অর্থ লাভ। একে আরবিতে ‘রিবহ’ও বলা হয়। পুঁজির বর্ধিত অংশকে বলা হয় মুনাফা; আর পুঁজির ক্ষয়প্রাপ্ত অংশকে বলা হয় লোকসান। মুনাফা বা লোকসান আসে বিনিয়োগ থেকে। বিনিয়োগ মানে হচ্ছে লাভ করার উদ্দেশ্যে

কোনো পণ্যসামগ্রী বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদন করা যাতে লোকসানের ঝুঁকিও অবশ্যই বহন করতে হয়। পণ্যসামগ্রী বা সেবা ক্রয় বা উৎপাদন করতে মোট যে ব্যয় হয়, তাকে বলা হয় মোট খরচ। সেই ক্রীত বা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা সেবা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় মোট আয়। মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই মুনাফা বা লাভ বলা হয়। মুনাফা ইসলামে বৈধ। একজন বিনিয়োগকারী তার পুঁজি বিনিয়োগ করে, লোকসানের ঝুঁকি বহন করে, তার মেধা ও শ্রম খাটায় ফলে উপযোগ সৃষ্টি ও মূল্য সংযোজন হয়। এসব কারণে বেশি দাম বা মুনাফা নেয়ায় তার অধিকার সৃষ্টি হয়। এসব সত্ত্বেও কোনো কারণে পণ্যসামগ্রী বা সেবার বাজার পড়ে গেলে বিনিয়োগকারীকে লোকসান দিতে হয়; অপরদিকে যদি বাজার দাম উঠে যায় তবে সে আশার চেয়েও বেশি লাভবান হয়ে থাকে। সুতরাং মুনাফা কিংবা লোকসানের বিষয়টি বাজারের ওপর নির্ভরশীল এবং অনিশ্চিত।

ড. আব্দুল্লাহ ত্বহা তার "বিভিন্ন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সুদের অবস্থা বইতে লিখেছেন,
সুদের প্রচলন বহু পুরনো বিষয়। এটিকে ভালো চোখে দেখা না হলেও এর প্রচলন বন্ধের তাগিদ প্রাথমিক যুগে অনেকেই দেননি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্বে সুদের প্রচলন ছিল। তবে এর বিরোধিতাও ছিল প্রায় সব সংস্কৃতিতেই। ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বের প্রাচীন সভ্যতায়ও সুদের প্রচলন লক্ষণীয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক সুদকে মন্দ বলে অভিহিত করেছেন। তারা এ ব্যবস্থা বন্ধের পক্ষে অনেকেই জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন, প্লেটো (৪২৮/৪২৭ খ্রি.পূ.-৩৪৮/৩৪৭ খ্রি.পূ.)। তিনি দেখান যে, সুদব্যবস্থা স্বভাবতই ন্যায়বান নাগরিকের ধারণার বিরোধী। কেননা, এ ব্যবস্থা নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা জানি,

টপিক:৩.১৪. প্লেটো তার Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে আদর্শরাষ্ট্রের ধারণা প্রবর্তন করেন

সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ন্যায়বান হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু সুদভিত্তিক সমাজ ন্যায়ধর্মপূর্ণ সমাজ হয় না। তাই সেখানে ন্যায়বান নাগরিক সৃষ্টি হতে পারে না।

টপিক:৩.১৫. অ্যারিস্টটল তার Politics নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখান যে,

অর্থসম্পদ ব্যবহারের দুটি দিক রয়েছে : এক ধরনের সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ধরনের অর্থসম্পদ গৃহস্থালি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয়। তার মতে, দ্বিতীয় ধরণের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় এবং এই ধরণের সম্পদ প্রশংসনীয়। কিন্তু যে ধরণের অর্থসম্পদ কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রকৃতিগতভাবে মূল্যবান বলা চলে না। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে এ বিনিময়মূলক অর্থকেই স্বকীয়ভাবে মূল্যবান করে নিয়ে তার জন্য অতিরিক্ত অর্থসম্পদ দাবি করা হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, এটি মোটেই স্বাভাবিক নয়। ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকেও দেখা যায়, বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর ভাবধারা অনুযায়ী সুদ অগ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সেমেটিক ধর্মগুলো সুদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইহুদি ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ এ সুদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সুদ সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অভিমত,

সর্বপ্রথম তার গুরু প্লেটোর যে ধারণাটির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, তা হলো : 'অর্থ নিষ্ফলা'। বস্তুত ছাগল, গরু বা অন্য কোনো প্রাণী বাড়ে, বৃক্ষ বা ফলনের গাছ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অর্থ বা টাকা নিজে বাড়ে না এটি প্রকৃতিগতভাবে বা স্বকীয়ভাবে বন্ধ্যা। একে কোনো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। তাই কেবল অর্থ প্রদান করে সেই অর্থের জন্য নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া সঙ্গত হতে পারে না।

টপিক:৩.১৬. ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে সুদ বা রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

ইসলামে সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, শোষণ ও অবিচারকে প্রশ্রয় দেয় এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

নিচে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণসমূহ তুলে ধরা হলো—

১. আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা:

কুরআন ও হাদিসে সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআনের আয়াত:

"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিনে এমনভাবে উঠবে যেন শয়তান তাকে স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।" (সুরা বাকারা: ২৭৫)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদ যদি রেখে না দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা।" (সুরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

হাদিস:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"সুদখোর, সুদদাতা, সুদের চুক্তি লেখক এবং এর সাক্ষী— এদের সবাই সমানভাবে অভিশপ্ত।" (মুসলিম, ১৫৯৮)

২. অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনীদের আরও ধনী করে এবং দরিদ্রদের আরও দরিদ্র করে তোলে। এতে সম্পদের সুষম বণ্টন বাধাগ্রস্ত হয় এবং গরিবরা শোষিত হয়।

৩. শ্রমবিহীন উপার্জন ও শোষণমূলক ব্যবস্থা:

সুদ হলো এক ধরনের শ্রমবিহীন উপার্জন, যেখানে ঋণদাতা কোনো পরিশ্রম না করেই নির্দিষ্ট মুনাফা গ্রহণ করে। এটি প্রকৃত ব্যবসায়িক নীতির পরিপন্থী এবং মানুষের ওপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে।

৪. সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে লোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। এতে সমাজে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যায়।

৫. বাস্তব অর্থনীতিকে দুর্বল করে:

সুদভিত্তিক অর্থনীতি বাস্তব উৎপাদন ও শ্রমনির্ভর ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে দুর্বল করে। এটি এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করে যেখানে টাকা থেকে টাকা তৈরি হয়, কিন্তু বাস্তবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না।

৬. দারিদ্র্য ও ঋণের ফাঁদ সৃষ্টি করে:

সুদভিত্তিক ঋণ মানুষকে ঋণের দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়। অনেক দেশ ও ব্যক্তি সুদের কারণে ঋণের চক্রে আটকে পড়ে এবং চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের শিকার হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : রিবার প্রভাব-ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্রে

টপিক:৪.১. ব্যক্তি পর্যায়ে রিবার প্রভাব

ক)আর্থিক ক্ষতি: রিবার কারণে ঋণগ্রহীতা অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়, যা তার আর্থিক সঙ্কট বাড়ায়।

খ)দারিদ্র্য বৃদ্ধি: উচ্চ সুদের কারণে অনেকেই ঋণের ফাঁদে পড়ে যায়, যা ব্যক্তিগত দারিদ্র্য বাড়ায়।

গ)মানসিক চাপ: সুদের বোঝা ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

ঘ)নৈতিক ক্ষয়: ইসলাম ধর্মে রিবা হারাম হওয়ায়, এটি গ্রহণ বা প্রদান করলে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টপিক:৪.২. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রিবার প্রভাব

ক)আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি: সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ধনী শ্রেণি আরও ধনী হয় এবং গরিব আরও গরিব হয়ে পড়ে।

খ)সম্পদ পুঞ্জীকরণ: ব্যাংক ও বড় ঋণদাতাদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়, যা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।

গ)সামাজিক অসন্তোষ: বৈষম্য ও বঞ্চনার ফলে সমাজে অসন্তোষ, অপরাধ ও সহিংসতা বাড়ে।

ঘ)অর্থনৈতিক দুর্বলতা: সুদ-নির্ভর বাজেট ও ঋণনীতির ফলে দেশ ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হ্রাস করে।

টপিক:৪.৩. বৈশ্বিক অর্থনীতিতে রিবার প্রভাব

ক)আন্তর্জাতিক ঋণনির্ভরতা: উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদেশি ঋণের সুদের ভারে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

খ)আর্থিক সংকট: সুদ-ভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থায় জটিল আর্থিক পণ্য তৈরি হয়, যা বৈশ্বিক মন্দা বা আর্থিক সংকটের কারণ হতে পারে (যেমন: ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা)।
গ)নীতিগত বৈষম্য: উন্নত দেশগুলো সুদের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে।

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামি অর্থব্যবস্থায় রিবার বিকল্প সমাধানসমূহ

সুদের লেনদের থেকে পরিত্রাণ পেতে ইসলাম বিকল্প কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

টপিক:৫.১. মুরাবাহা (Murabaha):

মুরাবাহা হলো এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক চুক্তি, যেখানে বিক্রেতা পণ্যের ক্রয়মূল্য ও নির্ধারিত মুনাফা জানিয়ে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে।ব্যাংক বা বিক্রেতা পণ্যটি প্রথমে নিজে কিনে নেয়।এরপর গ্রাহকের কাছে পূর্বনির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করে।এই চুক্তিতে সুদ নেই, বরং মুনাফা নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছভাবে জানানো হয়।

কুরআনের দলিল:

> "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"— সূরা আল-বাকারা: ২৭৫

মুরাবাহা হলো একটি বৈধ ব্যবসা চুক্তি যেখানে মুনাফা পূর্বনির্ধারিত ও সুদের সাথে সম্পর্কহীন।

হাদীসের দলিল:

> "তোমরা একে অপরের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে লেনদেন করো।"

— সহীহ বুখারী ও মুসলিম, সূরা নিসা: ২৯ আয়াতের তাফসিরে ব্যবহৃত

টপিক:৫.২. মুদারাবা (Mudarabah)

মুদারাবা হলো লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির ভিত্তিতে অংশীদারি চুক্তি, যেখানে একজন পুঁজি দেয় (Rabb-ul-Mal), আর অন্যজন ব্যবসা পরিচালনা করে (Mudarib)।
লাভ আগেই নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়।ক্ষতির দায় শুধুমাত্র পুঁজি দাতার; তবে ব্যবস্থাপকের গাফলতি থাকলে সে দায়ী।
হাদীসের দলিল: "রাসূল (সা.) খাদিজা (রা.)-এর মাল নিয়ে মুদারাবা ভিত্তিতে ব্যবসা করেছেন।"
— ইবনে সা'দ, তাবাক্বাতুল কুবরা, ১/১৩১
মুদারাবা একটি নবীজী (সা.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যবহৃত ব্যবসায়িক পদ্ধতি।

টপিক:৫.৩. মুশারাকা (Musharakah)

মুশারাকা হলো যৌথ অংশীদারি ভিত্তিকব্যবসা বা প্রকল্প, যেখানে একাধিক পক্ষ পুঁজি প্রদান করে ও ঝুঁকি ভাগ করে।সকল অংশীদার লাভ ও ক্ষতিতে অংশীদার হয়।লাভ বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী; ক্ষতি বণ্টন পুঁজির অনুপাতে।
কুরআনের দলিল:
"তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যবসার জন্য অংশীদার হিসেবে খরচ করে..."— সূরা নিসা: ১২
হাদীসের দলিল:
"আল্লাহ বলেন: আমি তৃতীয় শরিক থাকি, যতক্ষণ না একজন অপরকে ধোঁকা দেয়। যখন একজন অপরকে প্রতারণা করে, তখন আমি বের হয়ে যাই।"— আবু দাউদ, হাদীস: ৩৩৮৫

টপিক:৫.৪. ইজারা (Ijarah):

ইজারা হলো ইসলামিক লিজিং বা ভাড়া চুক্তি, যেখানে মালিক তার সম্পদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়ায় দেয়।সম্পদের মালিকানা থাকে মালিকের কাছে।ভাড়া নির্দিষ্ট এবং চুক্তিপত্র অনুযায়ী হয়।লিজ শেষে সম্পদ ফেরত দিতে হয় অথবা চুক্তি অনুযায়ী হস্তান্তর হতে পারে (ইজারা ওয়াল ইক্তিনা)।

কুরআনের দলিল:

"তাকে (মূসা আ.) ভাড়া করো, যাতে সে তোমার জন্য কাজ করে।"— সূরা কাসাস: ২৬

হাদীসের দলিল:

"তিনজন লোক যাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা অপরিহার্য... তাদের মধ্যে একজন হলো, যে ভাড়া নিয়ে কাজ করে এবং পরিশ্রম শেষে তার পারিশ্রমিক দেয়।"— সহীহ বুখারী

টপিক:৫.৫. সালাম ও ইসতিসনা (Salam & Istisna):

সালাম:

সালাম হলো এমন চুক্তি যেখানে আগাম মূল্য প্রদান করে ভবিষ্যতে পণ্য গ্রহণ করা হয়।কৃষিপণ্য বা মান নির্ধারিত জিনিসের জন্য উপযোগী।পুরো মূল্য আগেই দিতে হয়।

হাদীসের দলিল:

"যে ব্যক্তি খেজুরে সালাম চুক্তি করবে, সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ, ওজন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে।"— সহীহ বুখারী, হাদীস: ২২৪০

রাসূল (সা.) মদিনায় সালাম চুক্তিকে বৈধ ঘোষণা করেন।

ইসতিসনা:

ইসতিসনা হলো কারিগরি বা প্রস্তুতকৃত পণ্যের অর্ডার ভিত্তিক চুক্তি।নির্মাণ বা উৎপাদনাধীন জিনিসে ব্যবহৃত হয় (যেমন: বাড়ি, মেশিন)।মূল্য পরিশোধ ধাপে ধাপে বা পরে হতে পারে।

অর্থাৎ,ইসতিসনা সালাম-এর মতো হলেও কারিগরি ও প্রস্তুত পণ্যের জন্য, এবং এটি ইসলামি ফিকহবিদদের সর্বসম্মতিতে বৈধ।

টপিক:৫.৬. ওয়াকালা ও কফালা (Wakalah & Kafalah):

ওয়াকালা (Wakalah):ওয়াকালা হলো প্রতিনিধিত্ব চুক্তি, যেখানে একজন ব্যক্তি আরেকজনকে তার পক্ষ থেকে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করে।এজেন্ট নির্ধারিত ফি পেতে পারে।ব্যাংকিং বা বিনিয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কুরআনের দলিল:

> "আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন যে, তোমরা আমানত তার উপযুক্তদের কাছে ফিরিয়ে দাও..."— সূরা নিসা: ৫৮

(ওয়াকালা চুক্তি আমানতের ভিত্তিতে হয়)

কফালা (Kafalah):কফালা হলো জামিন বা গ্যারান্টি চুক্তি, যেখানে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দায়িত্ব নেয়।ঋণ পরিশোধ বা কোনো দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাদীসের দলিল (কফালা):

"যে ব্যক্তি কোনো লোকের জামিন হবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জামিন হবো।"— আবু দাউদ, হাদীস: ৩৫১১

উপরোক্ত বিষয় গুলো ছাড়াও সুদের লেনদের থেকে পরিত্রাণ পেতে ইসলাম আরও কিছু বিকল্প কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

টপিক:৫.৭. বাকিতে কেনা-বেচা

ইসলাম বাকিতে বেচাকেনা বৈধ করেছে। নগদ বিক্রি মূল্যের চেয়ে বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েজ। মানুষের সুবিধার্থে ও সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত হতে ইসলাম এ বেচাকেনা বৈধ করেছে।

টপিক:৫.৮. যাকাত

ইসলাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অভাবী ফকিরকে, বিপদগ্রস্ত পথিক প্রভৃতি অভাবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে জাকাতের বিধান প্রচলন করেছে।সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে ও মানুষের সম্মান সংরক্ষণে ইসলাম উপরোক্ত পদ্ধতি খুলে দিয়েছে। এভাবে তার অভাব মেটাতে সে সুউচ্চ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, তার প্রয়োজনের সুরক্ষা হয়, কর্ম ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

টপিক:৫.৯. কার্যে হাসানা:

ইসলাম বিনা লাভে ঋণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের সংস্থা হওয়াকে উৎসাহিত করেছে।ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো ধরনের সংস্থাকে এ ঋণের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে; যাতে উম্মতের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সহযোগিতা ও দায়ভার বাস্তবায়িত হয়।

টপিক:৫.১০. রিবার বিকল্প & কর্জে হাসানা

কর্জে হাসানার বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) ইসলামে অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ হিসেবে বিবেচিত। এটি এমন একটি ঋণ, যা কাউকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সুদবিহীনভাবে প্রদান করা হয় এবং এটি আদায় করার ক্ষেত্রে কোনও চাপ প্রয়োগ করা হয় না। কুরআন ও হাদিসে কর্জে হাসানার ফজিলত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে।
পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা কর্জে হাসানাকে উত্তম কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে সরাসরি আল্লাহর জন্য দেওয়া ঋণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
তিনি বলেছেন:
"কে এমন আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) দেবে, যা তিনি বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? আল্লাহই রিজিক সীমিত করেন এবং বাড়িয়ে দেন। আর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।"সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪৫

"তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, যা তিনি তাকে বহুগুণে ফিরিয়ে দেবেন এবং তার জন্য থাকবে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার?"সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ১১

এখানে স্পষ্ট যে, কর্জে হাসানা দান করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম এবং এর প্রতিদান অসীম পুরস্কার।

হাদিসে কর্জে হাসানা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্জে হাসানার ফজিলত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে আলোচনা করেছেন। যেমন:

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত:
নবী কারিম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে দয়া করে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে ঋণ দেয় এবং সময়মতো তা আদায় করার সুযোগ দেয়, তার প্রতিটি দিন সেই ঋণের দ্বিগুণ সদকার সমান সওয়াব লাভ করে।" (ইবনে মাজাহ)

টপিক:৫.১১. কর্জে হাসানার গুরুত্ব ও ফলাফল:

১.পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি:
কর্জে হাসানা একজন মুমিনকে আরেকজন মুমিনের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়।

২.আল্লাহর কাছে পুরস্কার:
এটি কেবল মানুষের জন্য সহায়তা নয়, আল্লাহর জন্য একটি ইবাদত।

৩.সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা:
এটি সমাজের দুর্বল ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক।

৪ অন্তর্দৃষ্টির চর্চা:
ঋণদাতার মধ্যে দয়া, ধৈর্য এবং সহমর্মিতার গুণাবলী গড়ে ওঠে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলামি ব্যাংকিং ও তাকাফুল (ইসলামি বীমা)

টপিক:৬.১. ইসলামি ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম

ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম শরিয়াহ্'র (ইসলামি আইন) মূলনীতি ও নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজে ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, সুদমুক্ত লেনদেন নিশ্চিত করা এবং বাস্তব অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণে ভূমিকা রাখা। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ (Profit and Loss Sharing - PLS):

মুদারাবা (Mudaraba): ব্যাংক মূলধন দেয় এবং উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনা করে। লাভ পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হয়, ক্ষতির দায় থাকে মূলধনদাতার।

মুশারাকা (Musharaka): উভয় পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে। লাভ-ক্ষতি বাস্তব অনুপাতে ভাগ হয়।

২. বাণিজ্য-ভিত্তিক লেনদেন (Trade-based modes):

মুরাবাহা (Murabaha): ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে এবং গ্রাহকের কাছে কিস্তিতে বিক্রি করে। লাভের পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত।

ইস্তিসনা (Istisna): অর্ডার ভিত্তিক উৎপাদন বা নির্মাণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। ব্যাংক নির্মাণকারীকে অর্থ প্রদান করে এবং সম্পূর্ণ পণ্য তৈরি শেষে গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করে।

সালাম (Salam): আগাম অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের চুক্তি। কৃষিপণ্য বা মৌসুমি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. ইজারা বা ভাড়াভিত্তিক লেনদেন (Leasing):

ইজারা (Ijarah): ব্যাংক কোনো সম্পদ গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া দেয়। ইজারার শেষে মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি থাকলে তা ইজারা ও ইক্তিনা নামে পরিচিত।

৪. সামাজিক কার্যক্রম:

ইসলামি ব্যাংকিং শুধু মুনাফার জন্য কাজ করে না, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে যাকাত তহবিল পরিচালনা, সদকা বিতরণ, এবং ওয়াকফ সম্পদ ব্যবস্থাপনা-তেও যুক্ত থাকে।

টপিক:৬.২. শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের ভূমিকা:

ইসলামি ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে শরিয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ইসলামি ব্যাংকে একটি শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড (Shariah Supervisory Board - SSB) গঠন করা হয়। এ বোর্ডে শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞ, মুফতি এবং ইসলামী অর্থনীতিবিদরা থাকেন। তাদের প্রধান ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. নীতি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা:

শরিয়াহ বোর্ড ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা শরিয়াহ অনুযায়ী উপযুক্ত কি না, তা যাচাই করে এবং প্রয়োজনমতো নীতিমালা প্রণয়ন করে।

২. নতুন পণ্যের অনুমোদন:

ব্যাংক যদি নতুন কোনো আর্থিক পণ্য বা চুক্তি চালু করতে চায়, তবে সেটি শরিয়াহ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হয়।

৩. বার্ষিক অডিট ও পর্যবেক্ষণ:
শরিয়াহ বোর্ড ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করে এবং একটি বার্ষিক শরিয়াহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Shariah Audit Report) প্রকাশ করে।

৪. গ্রাহক ও ব্যবস্থাপনার পরামর্শ প্রদান:
ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং গ্রাহকরা যাতে ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী লেনদেন করে, তা নিশ্চিত করতে বোর্ড প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৫. গায়র শরিয়াহ উপার্জন ব্যবস্থাপনা:
যদি কোনো উপার্জন শরিয়াহ পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে তা দান বা সদকা হিসেবে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়।

টপিক:৬.৩. তাকাফুল: ইসলামী বীমার ধারণা ও প্রয়োগ:

তাকাফুল (আরবি : التكافل , কখনও কখনও "সংহতি" বা পারস্পরিক গ্যারান্টি হিসাবে অনুবাদ করা হয়) অর্থ হল ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা পরিশোধের একটি সমবায় ব্যবস্থা, যা প্রচলিত বীমার ইসলামী বা শরিয়া -সম্মত বিকল্প হিসাবে সংগঠিত, যাতে রিবা (সুদ) এবং গারার (অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা) থাকে।
তাকাফুলের অধীনে, বিপদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি এবং কোম্পানিগুলি নিয়মিত অবদান ("অনুদান") প্রদান করে যাতে ক্ষতির ক্ষেত্রে সদস্যদের ক্ষতিপূরণ বা পরিশোধ করা হয় এবং তাদের পক্ষে একজন তাকাফুল অপারেটর দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যান্য ইসলামী অর্থ পণ্যের মতো, তাকাফুল ইসলামী মুয়ামালাত (বাণিজ্যিক ও দেওয়ানি আইন বা ইসলামী আইনের লেনদেন শাখা) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি ।
২০১৮ সালে, তাকাফুল শিল্প ২৭.৭ বিলিয়ন ডলারে "অবদান" আকারে বৃদ্ধি পেয়েছিল (২০১১ সালের ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে)। এই আন্দোলনকে "মানব পুঁজিকে পুনরুজ্জীবিত করে, ব্যক্তিগত মর্যাদা, সম্প্রদায়ের স্ব-সহায়তা এবং অর্থনৈতিক স্ব-উন্নয়নের উপর জোর দেয়" এমন বীমার "উন্নত বিকল্প" প্রদানকারী হিসেবে প্রশংসিত করা হয়েছে;

কিন্তু "আরবি পরিভাষা এবং চুক্তির ভাষা সহ প্রচলিত বীমা" শিল্পের সুযোগ "সঙ্কুচিত" বলেও সমালোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : বাংলাদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা:

বাংলাদেশের ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের বর্তমান অবস্থান (২০২৫ পর্যন্ত) সার্বিক চিত্র:বাংলাদেশের মোট ব্যাংকিং সম্পদের প্রায় ২৫% এখন ইসলামী ব্যাংকিং খাতে।দেশের **১০টি** পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং **১৯টি** প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী শাখা বা ইসলামি উইন্ডো পরিচালনা করছে।

টপিক:৭.১. সরকারি ব্যাংক :

সরকারি ব্যাংকে ইসলামী উইন্ডো ও শাখা:সরকারি ব্যাংকগুলো এখনো পুরোপুরি ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তর না হলেও ইসলামি উইন্ডো ও শাখা চালু করেছে:

১. সোনালী ব্যাংক:
ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো চালু রয়েছে।সোনালী ইসলামী বিনিয়োগ নামে পণ্য চালু করেছে।

২. অগ্রণী ও জনতা ব্যাংক:
কিছু শাখায় শরিয়াহভিত্তিক লেনদেন চালু হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক:
ইসলামি কৃষিঋণ পাইলট প্রোগ্রাম চালু করেছে।

টপিক:৭.২. বেসরকারি ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য আলাদা নীতিমালা ও তদারকি কাঠামো তৈরি করেছে।
বেসরকারি ইসলামি ব্যাংকগুলোর অবস্থান:বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি।
নিচে প্রধান ব্যাংকগুলোর কিছু তথ্য:

১.ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (IBBL):
দেশের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন ইসলামি ব্যাংক (প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৩)।মোট ইসলামী ব্যাংকিং সম্পদের প্রায় ৩৫-৪০% এককভাবে পরিচালনা করে।এই ব্যাংকের ৩৫০+ শাখা রয়েছে।

২.আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক:
সমাজকল্যাণভিত্তিক বিনিয়োগে সক্রিয়।হজ্জ সঞ্চয় স্কিম, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম ইত্যাদি চালু করেছে।

৩. সোসাইটি জেনারেল ইসলামি ব্যাংক (পূর্বে: সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক):
ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য শরিয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ সেবা দেয়।

৪.ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, EXIM ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক:
পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে।শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড রয়েছে প্রতিটিতে।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও উন্নয়ন:বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং তদারকির জন্য শরিয়াহ পরামর্শক কমিটি গঠন করেছে।২০২৩ সালে Digital Islamic Banking Guidelines প্রকাশ করেছে।যাকাত ও ওয়াকফ ব্যবস্থাপনাও ব্যাংকিং কাঠামোয় যুক্ত করার পরিকল্পনা চলছে।

সমস্যা সমূহ:

১.শরিয়াহ পরিপালনে কিছু ব্যাংকের গাফিলতি।
২.ইসলামি স্কলারশিপ ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি।
৩.সুদের সঙ্গে মিশ্র লেনদেনের ঝুঁকি।
৪.রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত বা ওয়াকফ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

টপিক:৭.৩. ইসলামি ব্যাংকগুলোর একীভূতকরণ কি কার্যকর সমাধান?

বিতর্কিত এস আলম গ্রুপের পরিচালনায় থাকা কয়েকটি ব্যাংকের সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও দেশে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের প্রসার ঘটছে।
এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সরকার বিদ্যমান সব ইসলামি ব্যাংক একীভূত করে দুটি ইসলামি ব্যাংক গঠন করতে পারে।বিদ্যমান অধিকাংশ ইসলামি ব্যাংক বর্তমানে সংকটে থাকায় দেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাতকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে ব্যাংক রেজুলেশন অর্ডিন্যান্স-২০২৫ অনুমোদন করেছে। দুর্বল ব্যাংকগুলো এই অধ্যাদেশের আওতায় অবসায়ন বা মার্জার হতে পারে।দেশে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এমনকি প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের তুলনায় বেশি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে এস আলম গ্রুপ একের পর এক বেশ কয়েকটি ইসলামি ব্যাংকের পরিচালনার দায়িত্ব নিলে এই খাত সংকটে পড়ে।

ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তার কারণে বিগত কয়েক বছরে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক প্রচলিত ব্যাংক এখন ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তরিত হতে আগ্রহী। যদিও সেসব ব্যাংক ডেডিকেটেড শাখা বা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং সেবা দিয়ে আসছে।

বর্তমানে দেশে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক আছে। সেগুলো হলো—ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন

ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক।গত বছর শেষে এই ১০ ব্যাংকের মোট আমানত ছিল তিন লাখ ৮৫ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। এদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ চার লাখ ৮৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চট্টগ্রামভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ থেকে এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাপক অনিয়মে জর্জরিত এই ছয় ব্যাংকের কয়েকটি সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের তারল্য সংকট কেটে যাচ্ছে।

ইসলামি ব্যাংকিং খাতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ভালো এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের অবস্থাও তেমন খারাপ নয়।

অন্তত তিনটি ইসলামী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা দ্য ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন, ১০ ইসলামি ব্যাংককে একীভূত করে দুটি বড় ব্যাংক গঠন বাস্তবসম্মত বলে বিবেচিত হবে না।

তাদের ভাষ্য, আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় দুই বা তিনটি ইসলামি ব্যাংককে একীভূত করা যেতে পারে।কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের মন্তব্য আমানতকারীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে বলেও মনে করেন তারা।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তাফা কে মুজেরি ডেইলি স্টারকে বলেন, 'ব্যাংকের সংখ্যা কমানোর চেয়ে সুশাসন ফিরিয়ে আনা ও আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

তার মতে, 'সুশাসন নিশ্চিত না করে যদি ব্যাংকের সংখ্যা কমানো হয় তাহলে ভালো ফল আসবে না।'

মুস্তাফা কে মুজেরি আরও বলেন, 'ব্যাংকিং খাতের সমস্যা দূর করে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তবে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান উন্নতি দেখা যায়নি।'

তিনি মনে করেন, ইসলামি ব্যাংকিং খাতের সমস্যাগুলো সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সরকার বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে একীভূত করে দুটি বড় ইসলামি ব্যাংক করলে সমস্যার সমাধান হবে না।

'দুর্বল ব্যাংকের সংখ্যা কমানোর পরিবর্তে সেগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। শুধু সংখ্যা কমানোই সমাধান নয়।'

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আমিন মনে করেন, দুর্বল ইসলামি ব্যাংকগুলোকে আগে শক্তিশালী করতে হবে। অন্যথায়, এটি ইতিবাচক ফল দেবে না।

তিনি ডেইলি স্টারকে বলেন, 'এখন এ ধরনের ব্যাংকগুলোকে বাঁচতে হবে। তাহলে সরকার ব্যাংক রেজুলেশন অর্ডিন্যান্সের আওতায় তাদের একীভূত করতে পারবে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংস্কার এজেন্ডার অংশ হিসেবে বেশিরভাগ ইসলামি ব্যাংক এখন বৈশ্বিক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদমানের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পর্যালোচনার পর কয়েকটি ব্যাংক একীভূত হতে পারে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

টপিক:৭.৪. চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা:

বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাত গভীর সংকটকাল অতিক্রম করছে। বিশেষ করে ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলোর চ্যালেঞ্জ বহুমাত্রিক। তারল্য সংকট, সুশাসন ও গ্রাহক আস্থার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকে সংকট এখন মারাত্মক পর্যায়ে। দিন দিন সংকটগুলো আরও গভীর হচ্ছে। ব্যাংকের শাখাগুলোতে টাকা উত্তলনের জন্য গ্রাহকদের ভিড় বাড়ছে। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় ব্যাংকের শাখাগুলোতে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের পক্ষ থেকে এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। কাজেই দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

ব্যাংক খাতের বর্তমান সমস্যা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে জটিল। এই সংকট হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। পতিত সরকারের নজিরবিহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, দখলদারি, লুটপাট, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং সার্বিক অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের আর্থিকখাত আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এক সময়ের সবল ও সফল ইসলামী ব্যাংক খাত এখন গভীর সংকটের মুখে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনা ২০০৬ সাল থেকে। সে সময়ে ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও জঙ্গি অর্থায়নের বানোয়াট অভিযোগ আনা হয়। যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই ঢালাওভাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে বিতর্কিত ও কলঙ্কিত করতে জঙ্গি অর্থায়নের নাটক সাজিয়ে তা ফলাও করে প্রচার করা হয়। তৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগ রয়েছে মর্মে ঘোষণা দেয়। এতে দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামী ব্যাংক বড় ধরনের ধাক্কা খায়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ থেকে সরকারের মদদে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে জঙ্গি অর্থায়নের মিথ্যা অভিযোগ এনে অনেক শাখা ও এটিএম বুথ ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ পতিত আওয়ামী লীগ সরকার ইসলামী ব্যাংকগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দখল নেয়। ২০১৭ সালের ৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় ইসলামী ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও এমডিকে

জোরপূর্বক পদত্যাগ করিয়ে ব্যাংকটি দখলে নেয় চট্টগ্রামভিত্তিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ। অবৈধভাবে দখল নেওয়ার পর এস আলম গ্রুপ ধীরে ধীরে ব্যাংকটির আর্থিক ভিত্তি ও পরিচালন কাঠামো দুর্বল করে দেয়। পেশাদার ব্যাংকারদের বাদ দিয়ে তাদের বিশ্বস্ত ও সহযোগী কর্মকর্তাদের পদায়ন করে। অযোগ্য ও অদক্ষ লোকবল ব্যাংকের শীর্ষ পদগুলোতে বসিয়ে অনিয়ম ও লুটের অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে।
সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মদদে এস আলম গ্রুপ ও আরও কিছু ব্যবসায়ী গ্রুপ একে একে দেশের প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক অবৈধভাবে দখল করে। এগুলো হলো- সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড। দখলের পর এসব ব্যাংকে অপেশাদার ও অদক্ষ লোকদের পারিচালক হিসেবে ব্যাংকের বোর্ডগুলোতে বসানো হয়। ফলে এসব ব্যাংকে সুশাসন ও পরিপালন কার্যক্রম ভেঙে পড়ে।

দুর্বল ইসলামী ব্যাংকগুলো অলিগার্কদের হাতে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো আইনি দুর্বলতা। ২০১১ সালের বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের এক আইনে বলা হয় কোনো ব্যাংকের পরিচালক হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার থাকতে হবে। ফলে অবৈধ টাকার মালিক ও রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ব্যবসায়ীরা শেয়ার অধিগ্রহণের মাধ্যমে রাতারাতি ব্যাংকের মালিক বনে যায়। মালিকানা লাভের পর জমিদারি স্টাইলে তারা ব্যাংকগুলোকে শুধু আমানত সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করে। সারাদেশ থেকে আমানত সংগ্রহ করে মুষ্টিমেয় কিছু ধনিক শ্রেণির হাতে সমস্ত সম্পদ তুলে দেয়। ফলে দেশে অলিগার্কদের জন্ম হয়। এরা বিনিয়োগের পরিবর্তে জনগণের টাকা লুটপাট ও বিদেশে পাচার করে।

নজিরবিহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণের ফলে ব্যাংকখাতের বর্তমান দুর্দশা। প্রকৃত ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ না দিয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিনিয়োগ এবং অযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিশাল অঙ্কের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কারণে খেলাপি বিনিয়োগ বেড়েছে। ভুয়া বিনিয়োগ ও ট্রেডিংয়ের নামে ব্যাংকের টাকা লুটপাট ও পাচার করা হয়। দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংক খাতে অনাস্থা এবং

অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংকগুলোর পরিচালক মনোনয়ন দেওয়ার ফলে ব্যাংকগুলোতে সুশাসনের অভাব দেখা দিয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের পথচলা শুরু হয়। সাধারণ মানুষ ফিরে পায় বাক-স্বাধীনতা। সেই সঙ্গে দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকখাত অবৈধ দখল থেকে মুক্ত হয়। ইসলামী ব্যাংকসহ দখলকৃত ব্যাংকগুলোর বিতর্কিত পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিপূর্ণভাবে শরিয়াহ পরিপালনের ব্যাপারে নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। জনগণের আমানত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো তা ঘুরিয়ে দিয়ে ইসলামী ব্যাংকখাতের বিনিয়োগ দেশের জনমানুষের কল্যাণে প্রবাহিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই খাতের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। শরিয়াহ পরিপালন, সম্পদের সুষম বণ্টন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ সর্বসাধারণের কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকিংখাত তার পূর্ব গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণদ্যোমে কাজ করার প্রত্যয়ে কাজ শুরু করেছে।(সূত্র-কালবেলা)

অষ্টম অধ্যায় :ইসলামি অর্থব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশসমূহ

এই পরিস্থিতিতে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ ও মতামত আলোচনা করা হলো :

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে দ্রুত তারল্য সংকট নিরসন করা :ইসলামী ব্যাংকসমূহে তীব্র তারল্য সংকট চলছে। এস আলম দখলকৃত ব্যাংকগুলোর কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তৈরি হয়েছে আস্থার সংকট। ফলে গ্রাহকদের আমানত তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে অভিভাবক সুলভ আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। খুব দ্রুত তারল্য সংকটের সমাধান না করলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওপর থেকে গ্রাহকদের আস্থা উঠে যাবে এবং ব্যাংকগুলো গভীর সংকটে পড়বে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তারল্য সুবিধা প্রদানের জন্য শরিয়াহসম্মত) পদ্ধতি উদ্বাবন করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে মানিমার্কেট চালু করতে হবে। বিদেশি সংস্থা হতে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ আনতে হবে। সুসুক বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে অর্থের জোগান ঘটাতে হবে। বিনিয়োগের বিপরীতে নেওয়া জামানত দ্রুত নগদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সর্বোপরি বিনিয়োগ আদায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

টপিক:৮.১.অনাদায়ী বিনিয়োগ আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ

বর্তমান সরকার নিয়মবহির্ভূতভাবে নগদ টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকগুলোকে তারল্য সুবিধা দিতে রাজি নয়। এর জন্য অনাদায়ী বিনিয়োগ আদায়ে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণখেলাপিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিকভাবেও চাপ প্রয়োগ করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক আশ্রয়ে খেলাপিরা সহায়তা না পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বিভিন্ন মিডিয়ায় ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ খেলাপিদের তথ্য প্রকাশ করে সামাজিকভাবে হেয় করতে হবে।

টপিক:৮.২.সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ ব্যাংক এ পর্যন্ত মোট **১১**টি ব্যাংকের বিতর্কিত পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে স্বতন্ত্র পরিচালকদের সমন্বয়ে নতুন বোর্ড গঠন করেছে। এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই ৭টি। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ করে সেহেতু এসব ব্যাংকের ৯০ শতাংশ সম্পদের মালিকানা ডিপোজিটরদের। সুতরাং ডিপোজিটরগণই হলেন ব্যাংকের প্রকৃত মালিক। এই বিষয়টি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যূনতম ২ শতাংশ শেয়ার ধারণের বিদ্যমান আইনটি বাতিল করে তথাকথিত মালিক প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ডিপোজিটর, শেয়ারহোল্ডার এবং পেশাদার ব্যাংকারদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। ইসলামী ব্যাংগুলোর পরিচালক নিয়োগে ব্যক্তির সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইসলামী অনুশাসন ও শরিয়াহ ব্যাংকিংয়ের প্রতি কমিটমেন্টকে প্রধান্য দিতে হবে।সংস্কার কমিটি, টাস্ক কমিটি, ব্যাংকিং কমিশনে ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা :

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে একটি টাস্ক কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির অন্যতম কাজ হলো আর্থিক খাতে বিগত সরকারের অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থপাচার ও লুটপাটের তদন্তসাপেক্ষে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে একটি দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

পাশাপাশি, ব্যাংক খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকিং টাস্ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকার ব্যাংকিং কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা করছে। দেশের ব্যাংকখাতের এক-তৃতীয়াংশই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আওতাধীন এবং বিগত সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসলামী ব্যাংকখাত। এ কারণে এসব কমিটিগুলোতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ ইসলামী ব্যাংক বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্ব থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে ব্যাংকার, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামিক স্কলারদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

টপিক:৮.৩.ইসলামী ব্যাংক ও অর্থায়ন খাতের জন্য স্বতন্ত্র টাস্কফোর্স :

গ্রাহকদের আস্থা ও সাধারণ মানুষের ভালোবাসার কারণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাত দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের যথাযথ সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে এখাত বার বার ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও শক্তিশালী রেগুলেটরি কাঠোমোর জন্য ব্যাংকখাত, ক্যাপিটাল মার্কেট, বিমা খাত এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরদের মাঝে সমন্বয় থাকা জরুরি। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক খাতে টেকসই উন্নয়ন ও রেগুলেটরি কাঠামো সুসংহত করতে সংশ্লিষ্ট রেগুলেটর ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

টপিক:৮.৪.পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন :

দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে ২০১১ সালে জারি করা বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইন বলে, যা এখন সেকেলে বিবেচিত হচ্ছে। ইতোপূর্বে বহুবার ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত উদ্যোগগুলো আলোর মুখ দেখেনি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে খসড়া ইসলামী ব্যাংকিং আইন-২০২৪ প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু এতেও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত উইন্ডো ও শাখাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং সেবা বন্ধের কথা বলা হয়েছে এ খসড়া আইনে, যা অনেকের মতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা। বৈশ্বিক ইসলামী ব্যাংকিং প্র্যাকটিসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইসলামী ব্যাংকখাত শক্তিশালী আইনি কাঠামো দিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করতে হবে।

টপিক:৮.৫. বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু :

দেশে বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ৩০টি প্রচলিত ব্যাংক এবং ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী অর্থায়ন সেবা প্রদান করছে। সব মিলিয়ে দেশের আর্থিক খাতের এক-তৃতীয়াংশ মার্কেট শেয়ার ইসলামী অর্থায়নের। সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ খাতের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও যথাযথ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডেডিকেটেড কোনো বিভাগ নাই। ফলে কাঠামোগত গুরুত্বের অভাবে ইসলামী ব্যাংকখাত অনেকাংশে উপেক্ষিত ও অভিভাবকশূন্য থাকায় বিগত সরকারের আমলে এই খাতে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। ইসলামী অর্থায়ন খাতের নিয়মতান্ত্রিক তদারকি ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যাপ্ত রিসোর্স ও অভিজ্ঞ জনবলসহ একজন ডেপুটি গভর্নর বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে ডেডিকেটেড ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ চালু করতে হবে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, পাকিস্তান এবং ওমানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ রয়েছে।

টপিক:৮.৬. উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলা :

ইসলামী ব্যাংক খাতে বর্তমানে ৫০ হাজারের বেশি জনবল কাজ করছে। এ খাতের জন্য মানবসম্পদের চাহিদা বেড়েই চলছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু মানুষের ধর্মীয় চাহিদার আলোকে শরিয়াহভিত্তিক অর্থায়ন সেবা দিয়ে থাকে, সেহেতু এখাতের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং ও শরিয়াহ জানা জনবলের প্রয়োজন। অথচ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখাতের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদের যোগান দিতে পারছে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শরিয়াহ লঙ্ঘনসহ নানা অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কারিকুলামসহ দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয় চালু করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ের গ্র্যাজুটেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও বাধ্য হয়েই এ সংক্রান্ত কোর্স চালু করবে। এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার ইনসিয়েফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে এবং আওফি, আইএফএসবি, ইসরাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সার্টিফিকেশন কোর্সগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং লিটারেসি উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি), সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ড ফর ইসলামীক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ (সিএসবিআইবি), ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ) এবং বাংলাদেশ আওফি ফেলোস ফোরাম (বাফ) সহ বিভিন্ন সংগঠন যৌথভাবে কাজ করতে পারে।

টপিক:৮.৭. জনগণের সম্পৃক্ততা ও আস্থা বৃদ্ধি :

ইসলামী ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো আর্থিক খাতে কল্যাণ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। ইসলামী ব্যাংক ও অর্থায়ন খাতের প্রতি সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা ও আস্থা বৃদ্ধির জন্য সকল পক্ষকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনেক বেশি। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন, মন্তব্য ও সমালোচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সচেতন থাকতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে এ খাত নিয়ে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোনো অনিয়মের ঘটনা ঘটলে যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ তা তুলে ধরতে হবে। সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার জন্য বিএবি, আইবিসিএফ, সেন্ট্রাল শরিয়াহ বোর্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নলেজ-শেয়ারিং ও ডায়ালগ প্রোগ্রাম আয়োজন করতে হবে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্ভাবনাময় অর্থনীতির একটি দেশ। এ দেশের মানুষ ও অর্থনীতি ভুল নেতৃত্বের দ্বারা বারবার প্রতারিত হয়েছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পেড়িয়ে গেলেও এ জাতি এখনো নিজ পায়ের ওপর শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। অর্থনীতির ভিত এখনো নাজুক। অথচ ৯২ ভাগ মুসলমানের এই দেশটিতে ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন খাত প্রসারের অপরিমেয় সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। এখন সময় এসেছে এ খাতে মনোযোগ দেওয়ার। ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় জরুরি। অনৈক্য ও বিবেধ ভুলে একযোগে কাজ করতে হবে। যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব, লাগসই আইনি কাঠামো এবং এ খাতসংশ্লিষ্টদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের ফলে ইসলামী ব্যাংক ও অর্থায়ন খাত এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানুষের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক এমনটিই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের।

নবম অধ্যায় :রিবা বা সুদ বিস্তারের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা & ইসলামে সমাধান:

টপিক:৯.১. আধুনিক বিশ্বে রিবা বা সুদের বিস্তার ও ইতিহাস:

আধুনিক বিশ্বে সুদ ছড়িয়েছে কে? এই বিশাল সুদচক্রের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য কি?

আধুনিক বিশ্বে সুদ ছড়িয়েছে মূলত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। ব্যাংকগুলি জনগণের কাছ থেকে টাকা জমা করে এবং সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করে। ব্যবসা থেকে লাভের একটি অংশ ব্যাংকগুলি জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু একটি অংশ নিজেরাই রেখে নেয়। এই রেখে নেওয়া অংশটিই হল সুদ।

ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে সুদ ব্যবস্থাও ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। এখন বিভিন্ন ধরনের সুদ ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন:

সাধারণ সুদ:

এই ধরনের সুদে, ঋণগ্রহীতা প্রতি বছর মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট হার সুদ হিসাবে প্রদান করে।

চক্রবৃদ্ধি সুদ:

এই ধরনের সুদে, ঋণগ্রহীতা প্রতি বছর সুদের উপরও সুদ প্রদান করে। ফলে, সুদের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অগ্রিম সুদ:

এই ধরনের সুদে, ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণের সময়ই একটি নির্দিষ্ট হার সুদ প্রদান করে।আধুনিক বিশ্বের সুদচক্রের ইতিহাস বেশ পুরনো। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঋণ নেওয়ার বিনিময়ে সুদ দিতে বাধ্য ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সুদ ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয় ছিল। মধ্যযুগে, খ্রিস্টান ধর্ম সুদকে নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদ ব্যবস্থা টিকে ছিল।

আধুনিক বিশ্বে, সুদ ব্যবস্থা একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি। এটি অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করতে

পারে, সরকারগুলি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং মানুষ তাদের প্রয়োজনের জন্য ঋণ নিতে পারে।

সুদচক্রের উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ীদের অর্থায়ন করা এবং অর্থের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা। সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারে এবং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে। এটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে, সরকারগুলি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং সেই অর্থ দিয়ে জনসেবা প্রদান করতে পারে। এটি সরকারের বাজেট ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে, মানুষ তাদের প্রয়োজনের জন্য ঋণ নিতে পারে। এটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে।

তবে, সুদচক্রের কিছু সমালোচকও রয়েছেন। তারা মনে করেন যে সুদ ব্যবস্থা গরিবদের শোষণ করে। সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে, ঋণগ্রহীতা ঋণের উপর যে সুদ প্রদান করে তা প্রায়শই তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এটি তাদের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা দেয়।

সুদচক্রের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য জটিল এবং বিতর্কিত। তবে, এটি আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ।

টপিক:৯.২. বর্তমানযুগে সুদ ছাড়া চলার বাস্তবতা:

যারা বলে, বর্তমান যুগে সুদ ছাড়া উন্নতি করা সম্ভব নয় তারা মিথ্যা বলে। সাহাবীদের যুগে যখন একেকজনের কাছে দুই দুই কোটি টাকা উপার্জন করেছিলেন তখন কি তাদের মাঝে সুদ-ভিত্তিক ব্যবসা প্রচলিত ছিল?না, তারা সুদকে নির্ঘাত হারাম জ্ঞান করতেন। তাই, সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে না- একথা একেবারে ভুল। ইসলাম একদিকে যেমন সুদকে হারাম আখ্যা দিয়েছে, অপরদিকে যাকাত এবং উত্তরাধিকার বণ্টন-রীতিও প্রবর্তন করেছে। এর ফলে সম্পদ কোন বিশেষ পরিবারে কুক্ষিগত থাকে না বরং যে পরিশ্রম করবে সে-ই সম্পদশালী হতে পারবে। আর এর ফলে দরিদ্রদের উন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধতা থাকে না।

মোটকথা, সুদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি বিষয় আর ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এতই অপছন্দনীয় যার কারণে, ইসলাম কোন ব্যক্তির সুদ গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'লার সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর আখ্যা দেয়। বলতে গেলে, এটিকে বিদ্রোহ করার মত একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। একইভাবে, সুদগ্রহীতাদের বিষয়ে ইসলাম বলে, তোমরা যদি এ থেকে বিরত না হও তাহলে আল্লাহ তা'লার সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা, তোমরা তার অবাধ্যতা করেছ।

টপিক:৯.৩. সুদের প্রয়োজনের ভ্রান্ত ধারণা ও ইসলামী সমাধান :

প্রশ্ন করা হয়, সুদ যদি হারামই হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান যুগে ইসলামের এ শিক্ষায় কীভাবে আমল করা সম্ভব? স্মরণ রাখা উচিত, ধর্ম একটি ব্যবস্থাপনার নাম। আর যেকোন ব্যবস্থাপনা তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা পূর্ণরূপে বলবৎ ও কার্যকর করা হয়।এর অসম্পূর্ণ প্রয়োগ পূর্ণাঙ্গীন ফলাফল বয়ে আনে না। যেমন, বর্তমান যুগে কাউকে সুদের ব্যাপারে বলা হলে সে বলে, সুদ ছাড়া তো চলাই সম্ভব নয়। তার একথার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান যুগে সমাজ এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে মানুষ সুদ গ্রহণে বাধ্য। বরং তার কথার অর্থ হল, সুদই বিপদের বন্ধু। অথচ, প্রকৃত বাস্তবতা হল, সুদ মানুষের বিপদের বন্ধু নয় বরং এটি একটি ব্যাধি যা মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে। তবে, ইসলামে এই ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। কিন্তু এই চিকিৎসা একটি ব্যবস্থাপনার সাথে

সম্পৃক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাপনা পূর্ণরূপে বলবৎ না হবে ততক্ষণ এটিপূর্ণাঙ্গীন ফলাফল বয়ে আনবে না।

যেমন, কোন ঘরের চতুষ্পার্শের প্রাচীর, ছাদ এবং দরজা-জানালা যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পন্ন না হবে সেই ঘর নিরাপত্তা প্রদান করতেপারে না। ইসলামের সকল শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে সুদের আর প্রয়োজনই থাকে না আর সুদের অনিষ্ট বা অপকারিতা থেকে পৃথিবী নিষ্কৃতি লাভ করে।

নিম্ন বর্ণিত পরিস্থিতিতে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়:

১. দরিদ্র মানুষ নিজের জীবনধারণের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

২. ব্যবসায়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক বা কৃষক নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্য ঋণ নিয়ে থাকে।

৩. বিপদগ্রস্ত কোন সম্পদের মালিক যার কাছে নগদ অর্থ নেই, অনাকাক্সিক্ষত কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঋণ নিয়ে থাকে।

(১) প্রথম পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট, দরিদ্র মানুষ যে আট টাকা উপার্জন করতে পারে না সে সুদে ৮ টাকা নিয়ে ৯ টাকা কীভাবে পরিশোধ করবে? কৃষকদের বর্তমান দুরবস্থা তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করছে। একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় মারা চরম অন্যায়। একজন এমনিতেই মৃতবৎ তার ওপর আরো বোঝা চাপানো কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

অবশেষে, এই অন্যায়ের ফলে আরেকটি অন্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ যখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে যায় তখন সে ঋণ গ্রহণের বিষয়টিকেই অস্বীকার করে বসে।

(২) দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে ব্যবাসায়ী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা কৃষক নিজ নিজ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাড়ানোর জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কৃষকের ক্ষেত্রে সম্পদের উন্নতির জন্য যদি ঋণ নিতে হয় তাহলে ইসলাম এক্ষেত্রে বন্ধক-ব্যবস্থাকে বৈধ রেখেছে। এর মাধ্যমে ইসলাম একদিকে মানুষকে নিজ সামর্থ্যরে বাইরে গিয়ে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে আর অপর দিকে বৈধ চাহিদা পূরণের পথও উন্মুক্ত রাখছে। একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকের ক্ষেত্রে ইসলাম অংশিদারিত্বের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য তাকে সুদের অনুমতি প্রদান করলে সে যদি নিজ ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, অন্যদের পূঁজি বিনষ্ট হল।

অপরদিকেতার সাফল্যলাভের অর্থ দাঁড়াবে, অগাধ সম্পদ এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়া যা ন্যায্যতা ও সামাজিক ভারসাম্য উভয়েরই পরিপন্থী।

(৩) উপরোল্লিখিত তৃতীয় পরিস্থিতিতে সুদকেবাহ্যত কিছুটা বৈধ আখ্যা দেয়া যেতে পারে কেননা, প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে যে আপত্তি উত্থাপিত হত এক্ষেত্রে তার সুযোগ নেই অর্থাৎ সে কোথা থেকে অর্থ পরিশোধ করবে- এই আপত্তি ওঠে না। তেমনিভাবে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে যে আপত্তি উত্থাপিত হয় তা-ও এক্ষেত্রে ওঠে না অর্থাৎ পুরো বিশে^র সকল সম্পদ নিজের বুদ্ধিমত্তার বলে নিজেরকুক্ষিগত করে ফেলারঅবৈধ চর্চার প্রশ্নও ওঠে না।
কেননা, এক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি ঋণ নিচ্ছে যার কাছে সম্পত্তি আছে বা উপার্জনের সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু এক অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তাকে একসাথে এত অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে যা তার কাছে একত্রে সঞ্চিত নেই। বাহ্যত দৃষ্টিতে বিবেক বলে, এ ব্যক্তির সুদে ঋণ গ্রহণের অনুমতি থাকা উচিত।বাহ্যত দৃষ্টিতেতাকে সুদে টাকা ঋণ দেয়াও অন্যায় হবে না কারণ, এই ব্যক্তি সম্পদশালী এবং মানুষের টাকা নিয়ে সে খেলাও করবে না।কেননা, তার কাছে সম্পত্তি আছে অথবা সে চাকুরিজীবি তাই এটি তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নিশ্চয়তা বিধান করে।
কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন ব্যক্তির জন্য সুদে টাকা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়া বেশি ভাল নাকি এমন ব্যক্তির জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা করাভাল? এই ব্যক্তি যদি সুদের অনুমতি পেয়ে যায় সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোক এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজের জন্য সুদ গ্রহণে বৈধতার ফতোয়া দিবে। আর এই অভিশাপ পৃথিবীতে আগের মতই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। নিশ্চয়ই এই তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিকল্প কোন পথ বের করাই শ্রেয় হবে।

টপিক:৯.৪. সুদ-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে ইসলামী নীতিমালার প্রাসঙ্গিক :

ইসলাম এ সমস্ত বিষয় দৃষ্টিপটে রেখে একটি সার্বজনিন শিক্ষা দিয়েছে। চারটি অনুচ্ছেদের আওতায় এ শিক্ষার সারাংশ টানা যায়-

১। প্রত্যেকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২। কোন এক ব্যক্তির হাতেঅগাধ সম্পদ কুক্ষিগত হতে না দেয়া।

৩। টাকা-পয়সা কারো কাছে সঞ্চিত থাকতে না দেয়া, বরং সবার কল্যাণার্থে এটি বিভিন্ন মানুষের হাতে (মূলধন হিসাবে) আবর্তিত করার ব্যবস্থা করা।

৪। যার ক্ষেত্রে বৈধ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তার চাহিদা পূর্ণ করাকে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা।

ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-১:

প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় ইসলাম রাষ্ট্রকে সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতি নিশ্চিত করার আদেশ প্রদান করে। আর এ জন্য যাকাত ও বিবিধ করের ব্যবস্থাপনা চালু করেছে এবং নিজ অনুসারীদের জন্য দান-খয়রাত আবশ্যক ঘোষণা করেছে।

ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-২:

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেরআওতায় ইসলাম সুদ-ভিত্তিক ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা অগাধ সম্পদ কেবল সুদে টাকা নেয়ার কারণেইকুক্ষিগত হয়ে থাকে আর এভাবে মানুষ অন্যদের টাকা দিয়ে এক প্রকার জুয়া খেলে। সাফল্যলাভ করলে সে কোটিপতি বনে যায় আর ব্যর্থ হলে সে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হয় না বরং সে অন্যদের টাকার ভরাডুবি ঘটায়। এক্ষেত্রে পাওনাদাররা বেশির বেশি তাকে জেলে দিতে পারে(কিন্তু সম্পদ উদ্ধার করতে পারে না)।উক্ত অনুচ্ছেদের অপরাংশের আওতায় ইসলামপরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের আদেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। কারও জন্য তার একক কোন সন্তানকে উত্তরাধিকারী বানানো বৈধ নয়। কেননা এর ফলে, তার অর্জিত সব সম্পদ বংশের একাংশের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়।

ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-৩:

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইসলামপরিত্যাক্ত সম্পদের বণ্টন ও যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে আর সুদকে নিষিদ্ধ করেছে।

ইসলামী শিক্ষা ও সমাধান অনুচ্ছেদ-৪:

চতুর্থ অনুচ্ছেদের আওতায় ইসলাম যাকাত, দান-খয়রাতের ব্যবস্থাপনা এবং বন্ধক রেখে মূলধন সরবরাহ বাব্যবসায়িক অংশিদারিত্বের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে।

মোটকথা, উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করেছে। এই পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বিশ্বে সার্বজনিনভাবে প্রয়োগ করার পরও যদি কোন খুঁত থেকে যায় সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধানেরবিষয়ে আপত্তি করা যেতে পারে। তা না হলে, একদিকে পশ্চিমা বিধিবিধান প্রচলিত রেখে ইসলাম সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে কী সমাধান দেয়- এ আপত্তি তোলা ভিত্তিহীন।

রোম ও ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন সভ্য দেশগুলোতে বহুকাল আগেই সুদবিষয়ক আইন-কানুন প্রণীত হয়। দুনিয়ার সব প্রধান ধর্মে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেদ, তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে সুদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। রোমান আইনশাস্ত্রে এবং হিন্দু ধর্ম-দর্শনে সুদের নিন্দা করা

টপিক:৯.৫. নিরুপায় অবস্থায় সুদের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইসলামি মতামত:

নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করা সুদের টাকা প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে? এই প্রসঙ্গে মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা এক কালেম লিখেছেন...

সম্প্রতি শেষ হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জুন ক্লোজিং। ফলে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে বার্ষিক সুদ বা মুনাফার টাকা। যারা সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে, তারা যথাসম্ভব সুদি কার্যক্রম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। জুন ক্লোজিংয়ের পর তাদের অ্যাকাউন্টে আসা টাকা নিয়ে চিন্তায় থাকে।

কারণ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। অতঃপর যদি তোমরা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৮-২৭৯)

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন এরা সবাই সমান। (মুসলিম, হাদিস : ৩৯৮৫)

সুদ সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের এমন নিষেধাজ্ঞার দরুন মুমিনরা সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করে।

কিন্তু কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে সুদভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়। যেমন—স্যালারি অ্যাকাউন্টের কথাই বলা যাক। সরকারি ও বেসরকারি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সাধারণত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সরাসরি হাতে হাতে দেওয়া হয় না, বরং ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সে জন্য কোনো ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নামে পৃথক পৃথক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে তার বেতন-ভাতা জমা দিয়ে দেয়। এরপর কর্মচারীরা ব্যাংকে গেলেই নিজ নিজ বেতন উঠাতে পারে। এই অ্যাকাউন্ট যেহেতু সেভিংস অ্যাকাউন্ট হয়, ফলে ইচ্ছা না থাকলেও তাদের অ্যাকাউন্টে সুদের অর্থ চলে আসে।

উল্লেখ্য, এখানে চাকরিজীবীর কিছুই করার থাকে না। কোনো চাকরিজীবী এতে আপত্তি করলেও তার জন্য প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে ইসলামী শরিয়াভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে দেবে না।

তারা সবার জন্য কোনো সুদি ব্যাংকে গ্রুপ অ্যাকাউন্ট করে রাখে। এখানে যেহেতু চাকরিজীবী বাধ্য। অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে তার কোনো এখতিয়ার নেই। তাই ওই সেভিং অ্যাকাউন্ট তথা স্যালারি অ্যাকাউন্ট খোলার গুনাহ চাকরিজীবীর ওপর আরোপ হবে না। এর সব দায় ও গুনাহ প্রতিষ্ঠানের হবে।

ধর্মপরায়ণ অনেক মুসলমানই বিষয়টা নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকে। এ পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় কী তা অনেকেই জানে না। এখানে কর্মচারীদের করণীয় হলো প্রতি মাসে স্যালারি অ্যাকাউন্টে বেতনের অর্থ আসা মাত্র তা তুলে শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত কোনো ব্যাংকে রেখে দেবে। যদি নিজের কাছে ক্যাশ রাখার কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা থাকে, সেটা আরো ভালো। কিন্তু এর পরও যদি বছর শেষে তার অ্যাকাউন্টে কোনো সুদ চলে আসে, তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই টাকা সুদদাতাকে ফেরত দিতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ১০/১২৪)

কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেহেতু নির্দিষ্ট সুদদাতা বের করা অসম্ভব, তাই সওয়াবের নিয়ত না করে কোনো জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত মিসকিনকে তা দান করে দিতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৭/১৬, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ১০/১২৬)

কোনো অবস্থায়ই সেই টাকা মসজিদ, মাদরাসা বা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ (যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ) ইত্যাদিতে খরচ করা যাবে না। (ইমদাদুল মুফতিন, পৃ: ৫৮৬, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ১০/১৩১)

দশম অধ্যায় :রিবা বা সুদের ভয়াবহতা, শাস্তি ও মুক্তির উপায় :

টপিক:১০.১. সুদের ভয়াবহ পরিণাম :

ইয়াতাখাব্বাতুহুশ শায়তানু মিনাল মাস- এখানে 'মাস্' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, উন্মাদনা। আর উন্মাদনার ফলে মানুষের চালচলনে উদভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং সে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এর অর্থ হল, তাদের (সুদখোরদের) কাজকর্মউন্মাদ উদভ্রান্ত লোকদের মত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, তাদের মাঝে যেমন গাম্ভির্যের অভাব, তড়িঘড়ি করার প্রবণতা ও উদাসীন্য দেখা দেয়- একই অবস্থা সুদখোরদের বেলায়ও ঘটে। সুদখোরদের কাজকর্মেও অযথা তাড়াহুড়ো সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় সচেতনতা ও সতর্কতা থাকে না। সাধারণত দেখা যায়, সুদ ভিত্তিক ব্যবসায়ীরা এমন এমন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফেলে যার ফলে কোন্দলের সৃষ্টি হয় আর তাদের অর্থ রসাতলে যায়। কোন উন্মাদ যেমন পরিণাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না তেমনিভাবে সুদ-ভিত্তিকব্যবসায় অর্থ লগ্নিকারীও ক্রমাগতভাবে সুদে অর্থ লগ্নি করতে থাকে কিন্তু এর পরিণাম কী হবে তা ভেবে দেখে না? তারা শুধু ওঁত পেতে থাকে, কখন নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে আর মানুষ আমাদের কাছ থেকে সুদে অর্থ ঋণ নিবে। আর এমন হলে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, সুদ-ব্যবস্থার কারণে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোও নিজেদের সামর্থের উর্ধ্বে গিয়ে সুদে ঋণ নেয়ার সাহস পায়। পরিণাম ভুলে গিয়ে তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে ওঠে। অথচ, বাস্তবতা হল, এমন দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ জাতির পর জাতিকে পদদলিত করে বা ধ্বংস করে ফেলে। এতে লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা এবং কোটি কোটি শিশু এতীম হয়ে যায়। এমন যুদ্ধ লক্ষ লক্ষসন্তান ও লক্ষ লক্ষ পিতাকে মৃত্যুপুরিতে পাঠিয়ে দেয়। কেবল সুদের মাধ্যমে তাদের আর্থিক মান বা অবস্থা বজায় থাকলেইএসব যুদ্ধঅব্যহত রাখা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দৈনিক সাত কোটি টাকা কেবল ইংরেজ সরকারের ব্যয় হত আর এর সমপরিমাণ, বরং এর চেয়েও বেশি ব্যয় হত জার্মানির। যদি সুদের পথউন্মুক্ত না থাকত তাহলে জার্মানি এক বছরও এই ব্যয় নির্বাহ করতে পারত না। আর তার সব রসদ স্বল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেত। জার্মানি কী করেছে? সুদের মাধ্যমে অর্থ যোগান নিয়ে কয়েক বছর পর্যন্ত যুদ্ধব্যয় নির্বাহ করেছে।বলতে গেলে লড়াইয়ের সূচনাও সুদের কারণেই হয়েছিল। জার্মানির বিপক্ষে জোটবদ্ধ রাষ্ট্রগুলো আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছে-একথা ঠিক, কিন্ত জার্মাানিকে যুদ্ধে অবতরণে কীসে সাহস যুগিয়েছে? এ সুদই সাহস

যুগিয়েছে। জার্মানি জানত, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি সুদের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী অর্থের যোগান পাবআর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব। সুদের পথ যদি বন্ধ থাকত তাহলে এত বড় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চিন্তাও সে করতে পারত না। আর যদি জার্মান নাগরিকদের ওপর কর আরোপ করা হত, তাহলে তারা এক বছরও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সুযোগ পেত না। কিছুদিনের মধ্যেই দেশে হট্টগোল শুরু হয়ে যেত, আমরা এত বড় বোঝা বহন করতে পারব না। কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে মানুষের ওপর বাস্তব হিসেবে যে বোঝা চাপছিলসুদে অর্থ নিয়ে মানুষকে সেই বোঝার বিষয়ে উদাসীন রাখা হয়েছে।

অতএব, সুদ যুদ্ধের একটি বড় কারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধের বিধিবিধানের পর কুরআন শরীফে সুদের উল্লেখ করেছেন, কেননা যুদ্ধের সাথে সুদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এরপর বলেন, যালিকা বিআন্নাহুম কালু ইন্নামাল বায়উ মিসলুর রিবা- এদের সুদ খাওয়ার কারণ হল, তারা বলে, এটিও একটি ব্যবসা।

আল্লাহ্ তা'লা এর খণ্ড করে বলেন, ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বায়আ ওয়া হাররামার রিবা। তোমাদের চোখে এ দু'টিরমাঝে কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এ দু'টিকে অভিন্ন আখ্যায়িত করেননি বরং এর মাঝে ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন।

সুতরাং এতদুভয়ের একটিকে বৈধ এবংঅন্যটিকে অবৈধ আখ্যায়িত করা স্পষ্ট প্রতিয়মান করছে, এ দু'টি জিনিষ এক নয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেহেতু একে নিষেধ করেছেন, নিঃসন্দেহে এতে কোন না কোন প্রজ্ঞা অবশ্যই থাকবে আর সেই প্রজ্ঞা তা-ই যা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত কথা হল, ইসলাম যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মানুষের সাথে সদাচরণ এবং দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতির ওপরসেই সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয়েছে। কিন্তু সুদ-ভিত্তিক বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা সদাচরণ ও সহমর্মিতা কী তা-ই জানেই না, তারা কেবল অর্থ বৃদ্ধি করতেই জানে আর এটিই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। এতে যদি কাউকে শ্বাসরুদ্ধ করতে হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। সুতরাং যেহেতু এর মাধ্যমে অন্যের সাথে সদাচরণ করার এবং গরীবদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় পক্ষান্তরে যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত হয় এ কারণে ইসলাম সুদকে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাসা-বাড়ী বা দোকান ভাড়া দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। ভাড়া এ কারণে নেয়া হয় কেননা ঘর বা দোকান ভেঙ্গে পড়ার

সম্ভাবনা রয়েছে আর এর মেরামতের জন্য ঘরের মালিকের কাছে কিছু না কিছু টাকা থাকাও প্রয়োজন। তেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কেননা ব্যবসায় এক ব্যক্তি নিজ অর্থের সাথে অন্যের অর্থের বিনিময় করে। অতএব, ক্রয়বিক্রয় এবং সুদকে একই বিষয় আখ্যা দেয়া বোকামী।

এরপর বলেন, ফামান জাআহু মাওয়েযাতুম র্মি রাব্বিহি ফানতাহা ফা-লাহু মা সালাফা ওয়া আমরুহু ইলাল্লাহ যার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উপদেশবাণী পৌঁছানো হয় আর সে তা শুনে অবাধ্যতা থেকে বিরত হয় তখন আমাদের বিধান হল, তার পূর্বেকার ত্রুটি -বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব না।

সুতরাং তোমরাও এমন লোকদের বিষয়টি খোদার হাতেন্যস্ত কর এবং তাদের তওবাকে গ্রহণ করে নিও।

হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি তওবা করার পর পুনরায় সেই কাজে লিপ্ত হলে এমন ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে। এখানে 'উলাইকা আসহাবুন্ নার, হুম ফীহা খালেদূন' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষ বলে বেড়ায় যে, সুদ ও ক্রয় বিক্রয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

কিন্তু তারা এটি দেখে না, এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্যই যদি না থাকত এবং দু'টি একই বিষয় হত তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এগুলোর মাঝে একটিকে হালাল এবং অন্যটিকে হারাম কেন আখ্যায়িত করেছেন? এরপর এ থেকে বিরত হলে কেন ক্ষমা করছেন? আর ক্ষমা লাভের পর যে পুনরায় সুদ নেয়া শুরু করবে তাকে শাস্তি কেন দিচ্ছেন? এ সব বিষয় সাব্যস্ত করছে, সুদ এবং ক্রয়বিক্রয় এক বিষয় নয়। সুদের পরিণাম নির্ঘাত আগুন; তা যুদ্ধের আকারেও প্রকাশিত হতে পারে কিংবা সামাজিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার আকারেও প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের পরিণাম তা নয়। এছাড়া সুদের এ ক্ষতি সাময়িক নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত এ অভিশাপ পৃথিবীতে বিরাজ করবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার আগুনও ততদিনজ¦লতে থাকবে। হুম ফীহা খালিদুন এদিকেই ইঙ্গিত করছে।(সূত্র: তফসীরে কবীর)

টপিক:১০.২. সুদ খাওয়ার শাস্তি:

সুদের আরবি পরিভাষা 'রিবা'। সুদ এক মারাত্মক ব্যাধি। ইসলামে এ সুদ খাওয়া হারাম। এর গুনাহও মারাত্মক। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মূলধনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সুদ। সুদের অপরাধ যেমন মারাত্মক তেমনি সুদের শাস্তিও মারাত্মক। এ সুদ এতই মারাত্মক যে, এর সর্বনিম্ন অপরাধটি হচ্ছে নিজ মায়ের সঙ্গে জেনা করার সমান। (নাউজুবিল্লাহ)

সুদের অপরাধ ও শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তা অনুমান করার জন্য নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন-'সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর সর্বনিম্নটি হলো নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ।' (মুসতাদরেকে হাকেম, আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস)

মুফতী মুহাম্মদ তাকি উসমানী(দা.বা)তাঁর 'ইসলামি মু'আমালাত' বইয়ের 'ইসলাম ও আমাদের জীবন -৩'- এর মধ্যে উল্লেখ করেন,

সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে

الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِهِ الْمُرْسَلِيْنَ
أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক বাণীতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন :

"সুদ খেলে কৃপণতা বাড়ে। কারণ, সুদ খাওয়ার কারণই হলো কৃপণতা—কারণ একজন সুদখোর মহাজন সুদ খেতে চায়, তার কল্পনে তার মাল কমে যাচ্ছে। এজন্য সে সুদ চায়। এমনকি আসে যে, সে নিজের দেখেশুনে যাক করার রাশি হয় না।"

সম্পদ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদারতা ও অসামর্থ্যশীল তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও কৃপণতা বৃদ্ধি হলো, সম্পদ যদি বাড়ে, কৃপণতা মারা যাওয়ার কথা তখন বুদ্ধি আর হয় না। একমাত্র কৃপণতাই হলো এমন একটি মানসিকতা যা সম্পদের পরিমাণে হ্রাস হয়

না। কেন, তার ফলে মানুষ শুধু কৃপণ না হয়ে সম্পদ অর্জনের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। নিম্ন শ্রেণির মানুষের সম্পদের পরিমাণ যত বাড়ে, দৃষ্টিতে মধ্যম শ্রেণির চাহিদাও তৈরী পাবে। কিন্তু কৃপণতার মধ্যে দৃশ্য হয় না এবং এই কারণে মানুষের মাঝে আত্মিক উন্নতির জন্য সে সব সম্পদের মোহ আরও বেড়ে যায়।

এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَقُوْلُ ابْنُ آدَمَ: مَالِيْ، مَالِيْ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমের সন্তান বলে, মাল আমার, মাল আমার। অথচ হে আদমের সন্তান! তোমার প্রকৃত মাল তো তিনটি জিনিসই হতে পারে। যদি তুমি কিছু খাও, তা হলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তুমি কিছু পরো, তা হলে তা পুরাতন হয়ে যায়। আর যদি দান করো, তা হলে তুমিই আবার একমাত্র লাভে পাবে।"

(মুসলিম, ৭৫৯; মুনাদির,১৩৭৬; তিরমিজি,: ২৩১২; মিশকাতুল মাসাবিহ, ১২২২)

টপিক:১০.৩. সুদের অপরাধ ও শাস্তির বিবরণ :

সুদ খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা সুদ খাওয়াকে শুধু হারামই ঘোষণা করেননি, সুদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান কেমন তা উপমাসহ কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াতে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

১. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা সুদ খায়, তারা কেয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি; যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত!

অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। এরপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, আগে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৫)

২. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৩০)

৩. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৮)

৪. يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৬)

মনে রাখা জরুরি

সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের লেনদেনে সাহায্য-সহযোগিতা করা; সবই হারাম এবং অভিশপ্ত কাজ।

এ সম্পর্কে হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে সতর্ক করেছেন-হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন- সুদখোর, সুদের হিসাব রক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি। তিনি আরও বলেছেন, (সুদের সঙ্গে জড়িত) তারা সবাই সমান অপরাধী।' (বাইহাকি, মিশকাত)

টপিক:১০.৪. সুদ খাওয়ার ৭০টি গুনাহ:

সুদ খাওয়ার ৭০টি গুনাহের মধ্যে ১টি হচ্ছে নিজ মায়ের সাথে যিনা করা(আস্তাগফিরুল্লাহ)। এটা কি গুনাহের ভয়াবহতা বুঝাতে বলা হয়েছে, নাকি আসলেই সমান গুনাহ?পূর্বের রাসূলগনের মধ্যেও সুদ হারাম ছিল এবং বর্তমানেও হারাম আছে, যা প্রত্যেক মুসলিম জানে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন:

বস্তুত: ইয়াহুদীদের জন্যে আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্যে হালাল ছিল, তাদের পাপের কারনে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমানে বাধা দেয়ার দরুন। আর এ কারনে যে তারা সুদ গ্রহন করত। অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারনে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায় ভাবে।

বস্তুত:" আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"...[সূরা আন-নিসা: ১৬০-১৬১]

কুরআনে আরও আছে:

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার..."(সুরা আলে ইমরান-১৩০)

সুদ একটি মারাত্মক পাপ, যার দ্বারা ক্ষতি সাধন হয় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের, সামাজিক জীবনের এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে:

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; মহান আল্লাহ তায়া'লার নিকট তা বর্ধিত হয় না । পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে...।"(সূরা- রুম, আয়াত-৩৯)

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে (কিয়ামতের দিন), যাকে (জ্বীন) শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয় । এটা এই জন্যেই যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত।"...

(সূরা-বাকারা, আয়াত-২৭৫)

"অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড়, তবে জেনে রাখ এটা আল্লাহ তায়া'লা ও তার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ । কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই । এতে তোমরা অত্যাচার করবেনা,অত্যাচারিতও হবে না...।"-(সূরা-বাকারা, আয়াত-২৭৯)

হাদীসে উল্লেখ আছে:

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন, সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান...[মুসলিম/জাবির (রাঃ), আবূ দাউদ, তিরমীযী]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"সুদ হল সত্তর প্রকার পাপের সমষ্টি । তার মাঝে সবচেয়ে নিম্নতম হল-আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা..."[ইবনে মাজাহ/ আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

"নিশ্চয়ই যে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম...।"[বুখারী, মিশকাত]

"হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। "...[মিশকাত]

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন:
শবে মেরাজ রাতে আমাকে উর্ধ্বলোকে বিচরণ করানোর সময় আমি আমার মাথার উপরে সপ্তম আকাশে বজ্রে প্রচন্ড গর্জনের শব্দ শুনতে পেলাম। চোখ মেলে এমন কিছু লোক দেখতে পেলাম,
যাদের পেটগুলো বিশাল ঘরের মত সামনের দিকে বের হয়ে আছে। তা ছিলো অসংখ্য সাপ ও বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। যেগুলো পেটের বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল (আ:) ! এরা কারা? তিনি উত্তরে বললেনঃ এরা সুদখোরের দল...[ইবনে মাযা ও আহমদ]
হযরত আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, যখন কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচার ও সুদ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে,
তখন আল্লাহ পাক সেই জাতিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন...[আবু ইয়া'লা ও হাকেম]

সুদ থেকে অর্জিত এক দিরহাম পরিমাণ অর্থ ইসলামের দৃষ্টিতে ৩৬ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ...[ইবনে মাজা, বায়হাকী]

হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা:) থেকে বর্ণিত, নবীয়ে আকরাম (সা:) বলেছেন:
"আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'জন লোক আমার কাছে আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলছে। যেতে যেতে আমরা রক্তে পরিপূর্ণ এক নহরের পাড়ে দাঁড়ালাম। এ সময় আমরা দু'জন লোককে দেখতে পেলাম,একজন এ নহরের মাঝে দাঁড়ানো, আরেকজন নহরের পাড়ে দাঁড়ানো। কিনারে দাঁড়ানো লোকটির সম্মুখে অনেকগুলো পাথর। নহরের ভিতরে দাঁড়ানোর লোকটি কিনারার দিকে আসতে ইচ্ছা করলে, পাড়ের লোকটি তার মুখে স্বজোরে পাথর নিক্ষেপ করে যে, লোকটি পুনরায় পূর্বেকার জায়গায় পৌঁছে যায়। সে যতবারই পাড়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।রাসূলে আকরাম (সা:) জিজ্ঞাসা করলেন: এ লোকটি কে?
যার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। উত্তরে বলা হল: এ হচ্ছে সুদখোর ব্যক্তি...[বুখারী]
রাসূলুল্লাহ্ (সা:) তার স্বপ্ন সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন: সুদখোর মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেয়া হবে। আর তার আযাব হবে, তাকে এমন নদীতে সাঁতার কাটতে হবে, যার পানি হবে রক্তের মত লাল। সুদের ভিত্তিতে দুনিয়ায় বসে সে সম্পদ সঞ্চয় করেছে আর হারাম সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য তাকে আগুনের পাথর খেতে হবে।এটাই হচ্ছে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বরযাখী জীবনের শাস্তি এর সাথে থাকবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ...[বূখারী]
কোন ব্যক্তির এক দিরহাম পরিমান সুদ উপার্জন করা মুসলমান অবস্থায় তেত্রিশ বার যিনা করা হতেও বেশি গুনাহের কাজ...[তাবরানী]
সুদের গুনাহ সত্তরটি। তার মধ্যে অপরাধের দিক থেকে সর্বনিম্ন গুনাহটি হল, আপন মায়ের সাথে যৌনাচারের গুনাহের সমান।আর সবচেয়ে জঘন্য প্রকারের সুদ হলো, সুদের পাওনা আদায়ের জন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি করা বা তার সম্পদ দখল করা...[ইবনে মাজা, তাবারানী]

এর থেকে বুঝা যায় যে সুদের গুনাহ্ নিজ মায়ের সাথে যিনা করার করার থেকেও মারাত্মক গুনাহ্। অর্থাৎ তার শাস্তি হবে যিনার পাপের থেকেও মারাত্মক।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সুদের মতো মারাত্মক হারাম কাজ ও কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। সুদমুক্ত জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন।আমিন।

টপিক:১০.৫. রিবা থেকে মুক্ত থাকার উপায় :

রিবা বা সুদ থেকে মুক্ত থাকার উপায়গুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর ভয় ও নিয়ত শুদ্ধ করা:

সুদ থেকে বাঁচার প্রথম ও প্রধান উপায় হলো আল্লাহর ভয় এবং হারাম থেকে বাঁচার দৃঢ় নিয়ত রাখা। **কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:**
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বাকি আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিই মু'মিন হও।"— (সূরা আল-বাকারা: ২৭৮)

২. সুদের লেনদেন এড়িয়ে চলা:

ব্যাংক, এনজিও বা ব্যক্তি থেকে সুদে ঋণ নেওয়া বন্ধ করুন।অন্যকেও সুদে টাকা দিতে নিরুৎসাহিত করুন।ক্রেডিট কার্ড বা সুদযুক্ত ঋণ ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

৩. ব্যবসা ও বিনিয়োগ হালাল পথে পরিচালনা করা:

হালাল ব্যবসা, পণ্য বা পরিষেবায় বিনিয়োগ করুন।ইসলামি ব্যাংকিং বা শরিয়া সম্মত বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন।মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা প্রভৃতি শরিয়া ভিত্তিক অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করুন।

৪. সুদযুক্ত অ্যাকাউন্ট বর্জন করা:
সুদবিহীন হিসাব (ইসলামিক সেভিংস অ্যাকাউন্ট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট) ব্যবহার করুন।
যদি পূর্বে সুদে উপার্জন হয়ে থাকে, তা সদকা করে দিন, কিন্তু সওয়াবের নিয়ত ছাড়া।

৫. আর্থিক পরিকল্পনা করা:

★নিজের খরচ ও আয়ের মাঝে ভারসাম্য আনুন।
★প্রয়োজন ছাড়া ঋণ না নেওয়ার অভ্যাস গড়ুন।
★সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করুন যেন প্রয়োজনের সময় সুদ নিতে না হয়।

৬. দোয়া ও ইস্তেগফার:

মুফতী মুহাম্মদ তাকি উসমানী(দা.বা)তাঁর 'ইসলামি মু'আমালাত' বইয়ের 'ইসলাম ও আমাদের জীবন -৩' এ উল্লেখ করেন,

রিবা থেকে বাঁচার একটাই পথ আছে। তা হলো, মানুষ নিজের শরীরের অনুরূপ বানাবে, অবৈধ কানাকানি সৃষ্টি করবে এবং বেশি-বেশি করে এই দুআটি করবে:

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ، وَرَزِّقْنِي فَهْمًا، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ، وَاجْعَلْنِي عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দীন-সম্পর্কে ফিকহ দান করুন, বুঝ দান করুন, আমাদেরকে দান করুন কানাকানি বন্ধ করার ফিকহ এবং তাৎক্ষণিকভাবে বরকত দান করুন। আল্লাহর রাসূল যখন কোন সম্পদ বরকতের জন্য দিতেন, তখন তিনি সম্পদ লাভের চেয়ে বরকতকে বড় উপকার বলতেন। পরিমাণের আধিক্য থাকার পরও যদি বরকত না থাকে, তা হলে কোটি টাকাও বেকার হয়ে যায়। তার দ্বারা কোনোই উপকার হয় না।

তাই রিবা বা সুদ থেকে মুক্ত থাকতে দোয়া করুন এবং আগের ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করুন:

আরবি দোয়া ১:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالدَّيْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই। আমি ঋণের ভারে চাপা পড়া ও মানুষের জুলুম থেকে আশ্রয় চাই।

টপিক:১০.৬. আল্লাহকে ভয় করুন, সুদকে না বলুন:

"আল্লাহকে ভয় করুন, সুদকে না বলুন" শিরোনামে মাওলানা আহমদ মায়মূন তার বইতে লিখেন,-বর্তমানকালে সুদ সম্পর্কিত লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। বড় আকারের প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভরশীল হয়ে গেছে সুদী লেনদেনের উপর। এ কারণে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো যখন সামনে আসে তখন তা বুঝতে, বুঝাতে এবং মেনে নিতে অনেকের মনে দ্বিধা-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অনেকে এক্ষেত্রে নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। এটা কোনো মুমিন-মুত্তাকীর জন্য আদর্শ পন্থা নয়। সুতরাং সকলের উচিত আল্লাহ তাআলার ভয়কে মাথায় রেখে পরকালের কথা চিন্তা করে ঠা-া মাথায় বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা, এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা শিরোধার্য করে নিয়ে নিজেদের কর্মজীবনের গতিপথ নির্ণয় করা এবং পরকালের পথ সুগম করা।

আরবী ভাষায় সুদের প্রতিশব্দ রিবা। বাংলাভাষায় ‘সুদ’ শব্দটি যেমন সুপরিচিত, তেমনি আরবী ভাষায়ও ‘রিবা’ শব্দের ব্যবহার বহুলপ্রচলিত।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলী যুগেও ‘রিবা’ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় রিবা অর্থাৎ সুদের লেনদেনও চালু ছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ.-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের রেওয়াজ ছিল এবং মূসা আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ তাওরাতেও ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের রেওয়াজ ছিল, পবিত্র কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা আ.-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কুরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার হাকীকত বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল-

كل قرض جر نفعا فهو ربا.

(যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।)

এ কারণে অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তাঁরা অকপটে মেনে নিয়ে সবধরনের সুদী লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইসলাম রিবা'র নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে কেবল নৈতিক বিবেচনার অধীনে রাখেনি; বরং তাকে পুরোপুরি আইনের মর্যাদা দিয়েছে। এ বিষয়ে বিদায় হজ্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নবীজী বলেছেন-

أَلَا كُلّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ،... وَرِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَإِنّهُ مَوْضُوعٌ كُلّهُ.

সাবধান! জাহেলিয়্যাতের প্রত্যেক বিষয় আমার দু'পায়ের নীচে।... জাহেলীযুগের 'রিবা' বাতিল। আর প্রথম রিবা, যা আমরা বাতিল করছি তা আমাদের রিবা; আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের রিবা। তা পুরোটাই বাতিল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস **১২১৮**

বর্তমান পৃথিবীতে দু'ধরনের সুদী লেনদেন বেশি প্রচলিত।
এক. মহাজনী সুদ, অর্থাৎ কেউ কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে এর বিপরীতে ঋণের অতিরিক্ত যে অর্থ নেওয়া হয়।
দুই. বাণিজ্যিক সুদ, যা কোনো উৎপাদনমূলক কাজে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা- সর্বপ্রকার সুদ হারাম।
কেউ কেউ প্রতারণা করে বলে থাকেন যে, পবিত্র কুরআনে যে 'রিবা' তথা সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার দ্বারা প্রথম প্রকারের সুদ অর্থাৎ মহাজনী সুদ উদ্দেশ্য, যা কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়। তারা এই ধোঁকার ভিত্তি রেখেছে আরেক মিথ্যা দাবির উপর। তারা বলে, কেবল এ ধরনের সুদই নাকি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং পূর্ববর্তী

জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। তাই এরূপ সুদকেই কুরআনে কারীমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রচলিত বাণিজ্যিক সুদ (commercial intarest)-এর রেওয়াজ এবং লেনদেন নাকি সে যুগে ছিল না। সুতরাং তাদের ধারণা মতে এরূপ সুদ কুরআনে কারীমে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।আসলে বিষয়টি এমন নয়।

প্রথমত এ ধারণা ঠিক নয় যে, রিবা'র যে পদ্ধতি জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল না, তা হারাম নয়। কেননা, ইসলাম যখন কোনো জিনিষকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে তখন তার একটি নির্দিষ্ট পরিচয় থাকে। সেই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়। নিছক পন্থা-পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে বিধান পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণত কুরআনে কারীমে মদকে হারাম করা হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মদ প্রস্তুত করার যেসব পন্থা-পদ্ধতি ছিল তার সবই হয়ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু মদ তো ঠিকই রয়ে গেছে, তাই মদ হারাম হওয়ার বিধানও বদলায়নি। এমনিভাবে অশ্লীল কর্মকা- কুরআন নাযিল হওয়ার সময় একরকম ছিল, বর্তমানকালে তার ধরন অনেক পাল্টে গেছে, তবু অশ্লীলতার নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। সুদ জুয়া'র অবস্থাও তাই। এখন যদি সুদকে আধুনিক ব্যাংকিং অর্থব্যবস্থা বলে এবং জুয়াকে লটারী বলে বৈধ মনে করা হয় তাতে তো শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলোকে বৈধ বলা যাবে না।

একবার নাকি কোনো ভারতীয় নামকরা সঙ্গীতশিল্পী এক আরব বেদুইনের গান শুনে বলেছিল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের গান শোনার কারণেই গানকে হারাম বলেছেন। এরূপ বেসুরো গান হারাম হওয়ারই কথা। আমাদের গান শুনলে কখনও তিনি গানকে হারাম বলতেন না।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত সুদের নিষেধাজ্ঞাকে জাহেলী যুগের প্রচলিত বিশেষ কোনো সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করাও ঠিক এমনই।

এছাড়া কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট বা বাণিজ্যিক সুদ জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল না- এমন নয়; বরং তখনও এধরনের বাণিজ্যিক সুদ লেনদেনের রেওয়াজ ছিল। সেযুগে সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সুদভিত্তিক লেনদেনে বর্তমানকালের ব্যাংকের মতো ভূমিকা পালন করত। এছাড়া এক গোত্রের ব্যবসায়ীরা নিজ গোত্রের বা অন্য গোত্রের ব্যবসায়ীদের

নিকট থেকে মোটা অংকের সুদী ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে খাটাত। কখনও বা সুদী ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদনের কাজে লাগত।

হাদীস ও তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে আছে, আম্র ইবনে আওফের গোত্র মুগীরার গোত্রের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করত আর মুগীরার গোত্র তা পরিশোধ করত। এভাবে জাহেলী যুগে তাদের লেনদেন চলত। ইসলামের আগমনের পরও মুগীরার গোত্রের কাছে আম্র-এর গোত্রের মোটা অংকের সুদ পাওনা ছিল। যা বাতিল করা হয়েছিল।

উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব সুদী লেনদেন মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো অভাব বা অর্থসংকটের কারণে ছিল না, যাকে 'মহাজনী সুদ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুদী লেনদেন।

এছাড়া তখনকার আরবের লোকেরা কখনও গোত্রের সাধারণ মানুষের অর্থকড়ি এক জায়গায় একত্র করে সেগুলো ব্যবসার কাজে লাগাত। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কাফেলার বিষয়টি ছিল, সেটিও ছিল একটি ব্যবসায়ী পণ্য আমদানিকারক কাফেলা। সে ব্যবসায় কুরায়শের সকল মানুষের অর্থ লগ্নি করা ছিল।

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম সে যুগের বেশ বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর আমানতদারির সুনামও ছিল সবার কাছে প্রসিদ্ধ। এজন্য অনেকে তাঁর কাছে অর্থ আমানত রাখতে আসত। তিনি সেগুলো আমানত হিসাবে না রেখে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতেন, যাতে মালিকের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এরপর তিনি এসব অর্থ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতে খাটাতেন। ইনতেকালের সময় তাঁর কাছে মানুষের প্রাপ্য ঋণ ছিল বাইশ লক্ষ দেরহাম। তখনকার সময়ের হিসাবে এ পরিমাণ অর্থকে ছোটখাটো পুঁজি বলা যায় না। এসব ঋণ তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল মূলত তাঁর ব্যবসায়িক ঋণ। সুতরাং এ কথা বলা যে, সে যুগে ব্যবসায়িক ঋণের রেওয়াজ ছিল না- ঠিক নয়।এ ছাড়া আরও অনেক নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়।

অতএব কুরআনে কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের ভাষ্য-

প্রথম আয়াত :

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

দ্বিতীয় আয়াত :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন। আর সদকা দানকারীর অর্থ-সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

পঞ্চম আয়াত :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩০

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

ভালো ভালো যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি; তাদের সীমালংঘনের জন্য, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। -সূরা নিসা (৪) : **১৬০-১৬১**

উক্ত দুই আয়াতে ইহুদীদের যেসকল অপরাধের কারণে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি ছিল তাদের সুদ গ্রহণের অপরাধ। এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তবু তারা সুদ গ্রহণ করত। তাই তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে :

এক. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ... وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ...

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ কী? তিনি বললেন-

১. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা,
২. জাদু করা,
৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন।
৪. সুদ খাওয়া,
৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা,
৬. জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া।

৭. সতী-সাধ্বী সরলমনা-উদাসীনা মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপকর্মের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭৪; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩৬৭১

দুই. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে-

'আমি দেখলাম আজ রাতে আমার কাছে দু'জন মানুষ আসল এবং তারা আমাকে একটি পবিত্র ভূখণ্ডে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্তের নদীর কিনারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই নদীতে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। আর নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন পুরুষ। তার সামনে রয়েছে পাথর। যখন নদীর লোকটি কিনারে উঠতে চায় তখন কিনারে থাকা লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে লোকটি যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যায়। এরপর সে আবারও নদীর কিনারে উঠতে চায়, এভাবে সে যখনই কিনারে উঠতে চায় তখনই তাকে পাথর মেরে যেখানে ছিল সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আমি আমার সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, রক্তের নদীতে অবস্থিত লোকটি, যার মুখের উপর পাথর মেরে আপন জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে লোকটি কে? তখন তাদের একজন আমাকে বললেন, এ লোকটি সুদখোর।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৬, ২০৮৫

তিন. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.

যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে সুদ খাওয়ায় উভয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫১০৪

চার.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ৭টি গুনাহকে বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল সুদ খাওয়া। -মুসনাদে বাযযার; আল মু'জামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৭০৯

পাঁচ. অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সকলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদীসে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এই ভয়াবহতম হারাম কর্মটিকেই এখন বানিয়ে ফেলা হয়েছে অতি উপাদেয় একটি বিষয়। মতলববাজ লোকেরা সকল শ্রেণির মুসলমানদের এতে জড়ানোর জঘন্যতম কাজটি করে যাচ্ছে বিনা বাধায়

।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া ও হেদায়েতের পথে চলার তাওফীক দান করুন।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হালাল পথে চলার তাওফিক দান করুন।

একাদশ অধ্যায় :উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে বলতে পারি,ইসলামি অর্থনীতিতে রিবা (সুদ) একটি গুরুতর নিষিদ্ধ বিষয়, যা সমাজে অন্যায় অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যাহত করে। আল-কুরআন ও হাদিসে রিবার কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলাম সমাজে ন্যায়ের ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন, সহানুভূতি, দান, ব্যবসায়িক ন্যায়নীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। তাই ইসলাম রিবার পরিবর্তে বিকল্প সমাধান হিসেবে মুরাবাহা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি ন্যায্য ও অংশীদারিত্বভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে, যেখানে ঝুঁকি ও লাভ-ক্ষতি উভয়ই ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়।

কুরআনের আয়াত:

قوله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" <

"۝فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

— সূরা আল-বাকারা: ২৭৮-২৭৯

অর্থ:"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে অংশ অবশিষ্ট রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। যদি তোমরা তা না কর, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনছ।"

হাদীস:

عن جابر رضي الله عنه قال:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ :هُمْ" < سَوَاءٌ"

رواه مسلم، حديث رقم :1598 —

অর্থ:

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, লিখনকারী এবং সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "তারা সবাই সমান অপরাধী।"

সুতরাং, পরিশেষে বলতে পারি
রিবা সমাজে এক ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ব্যাধি, যা ইসলাম নির্মূল করতে চায় ন্যায্যতা ও ইনসাফের মাধ্যমে। ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি ব্যবস্থায় সুদের বিকল্প হিসেবে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নৈতিক, ন্যায্য এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ ব্যবস্থা কেবল মুসলিম সমাজেই নয়, বরং সারাবিশ্বে একটি টেকসই, মানবিক ও সমতাভিত্তিক অর্থনীতির মডেল হতে পারে।

তাই আমাদের উচিত, রিবার ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে ইসলামি অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করা এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করা।

দ্বাদশ অধ্যায় :গবেষণার সারসংক্ষেপ:

এই গবেষণায় ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক ধারণা, কাঠামো, এবং এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামি অর্থনীতি একটি ন্যায়ভিত্তিক ও নৈতিক অর্থব্যবস্থা, যা কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ফিকহের আলোকে পরিচালিত হয়। রিবার (সুদ) মত একটি বড় সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান কীভাবে কার্যকর হতে পারে, তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় বাংলাদেশের বাস্তবতা, প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং ইসলামি অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগযোগ্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে, এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে কিছু সুপারিশ এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

টপিক:১২.১. ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক ধারণা ও কাঠামো:

ইসলামি অর্থনীতি হল এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এর মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। এতে সুদ, জুয়া, প্রতারণা, অনৈতিক লেনদেন নিষিদ্ধ এবং হালাল উপার্জন, যাকাত, দান, ওয়াকফ প্রভৃতি উৎসাহিত করা হয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থার কাঠামোতে শরিয়াহ আইন অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, বণ্টন এবং ব্যয় পরিচালিত হয়—যার মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক, দায়িত্বশীল এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়।

টপিক:১২.২. রিবার সমস্যা ও ইসলামি সমাধান:

রিবা বা সুদ এমন একটি আর্থিক চর্চা যা ধনীর পক্ষে সুবিধাজনক হলেও দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে। এটি অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ইসলাম এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন সুদবিহীন অর্থনৈতিক উপায় প্রদান করেছে, যেমন:

মুরাবাহা (লাভসহ বেচাকেনা),

মুদারাবা (লাভ-ক্ষতির অংশীদার ভিত্তিক বিনিয়োগ),
মুশারাকা (অংশীদারিত্বে ব্যবসা),
ইজারা (ইজারা বা ভাড়া ভিত্তিক চুক্তি),
যাকাত ও সদকা (আর্থিক ভারসাম্য তৈরি)।
এসব সমাধান সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করে।

টপিক:১২.৩. তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ:

ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে বুঝতে হলে তা প্রচলিত পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতে হয়।
পুঁজিবাদ ব্যক্তি মালিকানা ও মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।
সমাজতন্ত্র সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সমবণ্টনের নীতি মেনে চলে।
ইসলামি অর্থব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃতি দেয়, তবে সম্পদের ব্যবহার ও বণ্টনে শরিয়াহর নির্দেশ মেনে চলে। এতে মুনাফা বৈধ, কিন্তু তা নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্পদের ওপর যাকাত ও দানের মাধ্যমে সমাজে ভারসাম্য তৈরি হয়।
এই তুলনায় দেখা যায় ইসলামি অর্থনীতি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে, যেখানে নৈতিকতা, জবাবদিহিতা ও সাম্য গুরুত্ব পায়।

টপিক:১২.৪. বাংলাদেশে এর প্রয়োগযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা:

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়ায় ইসলামি অর্থব্যবস্থার প্রতি জনগণের আগ্রহ রয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং, বীমা (তাকাফুল), যাকাত-ভিত্তিক সেবা এবং শরিয়াহ ভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। তবে এর আরও ব্যাপক প্রয়োগে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

উপযুক্ত আইন ও নীতিমালার অভাব

জনসচেতনতার সীমাবদ্ধতা

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রভাব

এগুলো দূর করা গেলে ভবিষ্যতে ডিজিটাল ইসলামি ব্যাংকিং, ইসলামি মাইক্রোফিন্যান্স, কৃষি অর্থনীতি ও পরিবেশ অর্থনীতিতেও ইসলামি পন্থার সফল প্রয়োগ সম্ভব। এভাবে দেশীয় অর্থনীতিতে নৈতিকতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধিত হতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় :সুপারিশমালা

টপিক :১৩.১. সরকারিভাবে ইসলামি অর্থনীতির প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করা:

ইসলামি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সহায়তা জরুরি। এক্ষেত্রে সরকার প্রণোদনা, আইনগত স্বীকৃতি, ও নীতিগত সমর্থন দিতে পারে।

টপিক :১৩.২. শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচেতনতা ও জ্ঞানভিত্তিক আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে।

টপিক :১৩.৩. ইসলামি ব্যাংকিংয়ের কাঠামো শক্তিশালী করা:

শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষ জনবল, প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। শরিয়াহ বোর্ডের কার্যকারিতা বাড়াতে হবে।

টপিক :১৩.৪. রিবার বিকল্প প্রথাগুলোর প্রয়োগ বৃদ্ধি:

মুশারাকা, মুদারাবা, ইজারা ইত্যাদি ইসলামি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রয়োগ বাড়াতে হবে, যাতে সুদের বিকল্প গ্রহণযোগ্য হয়।

টপিক :১৩.৫. আইনি ও নীতিগত সহায়তা:

ইসলামি অর্থব্যবস্থা কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের সংশোধন করা জরুরি। অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি পৃথক ইসলামি অর্থনীতি সেল প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায় :ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র:

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অর্থব্যবস্থায় ইসলামি নীতির বাস্তবায়ন এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন।

টপিক :১৪.১. ইসলামি অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর:

ইসলামি অর্থনীতিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সংযোজন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং, ইসলামিক ফিনটেক, ব্লকচেইন ভিত্তিক স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, এবং ডিজিটাল ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা ইসলামি আর্থিক লেনদেনকে আরও স্বচ্ছ, নিরাপদ ও সহজলভ্য করে তুলছে। এসব প্রযুক্তি শরিয়া ভিত্তিক আর্থিক সেবা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

টপিক :১৪.২. ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ:

বিটকয়েন ও অন্যান্য ডিজিটাল মুদ্রা ইসলামে হালাল না হারাম, তা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণে গভীর গবেষণা দরকার।

১৪.৩. গ্রামীণ অর্থনীতি ও ইসলামি মডেল:

পল্লী উন্নয়ন, মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে ইসলামি অর্থনীতির কী ভূমিকা থাকতে পারে তা অনুসন্ধানযোগ্য।

১৪.৪. পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থনীতি: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে ইসলামি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী ভূমিকা রাখতে পারে তা গবেষণার নতুন ক্ষেত্র।

১৪.৫. ইসলামী ব্যাংকিং-এর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি:

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত পদ্ধতি বনাম ইসলামি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কৌশল নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা প্রয়োজন।

পঞ্চদশ অধ্যায় :গ্রন্থপঞ্জি:

১.আল কুরআন

২.তফসীরে কবীরের-হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

৩.ইসলামি মু'আমালাত- মুফতী মুহাম্মদ তাকি উসমানী (দা.বা)

৪.কুরআন-হাদিসের আলোকে সুদের ক্ষতি-অপকার-কুপ্রভাব-সায়ীদ বিন আলি বিন ওয়াহাফ আল কাহতানি;অনুবাদ- আলী হাসান তৈয়ব

৫.ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ-ড.এম উমর চাপরা

৬.বিভিন্ন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সুদের অবস্থান -ড.আবদুল্লাহ ত্বহা

৭."আল্লাহকে ভয় করুন, সুদকে না বলুন"- মাওলানা আহমদ মায়মূন

৮.উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি

৯.সংবাদপত্র:

ক)মাসিক আল-কাউসার

খ)কালবেলা

গ)কালের কণ্ঠ

১০.ইলেকট্রনিক মিডিয়া:

ক)Wikipedia

খ)BOU-BOOK

গ)Education AI

ঘ)banglanews24.com

ঙ)Hadithbd

~ সমাপ্ত ~